অবিশ্বাস

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন

জীবনে প্রথম অবিশ্বাসের কবলে পড়ি ৯৯ সালে এইচএসসিতে পড়া অবস্থায়। প্রচণ্ড ভালো লাগে ক্লাস এইটে পড় য়া তাসলিমাকে।

প্রস্তাবটা দিতেই ফোস করে উঠে বললো, কি! আপনি না গতকাল সাথীকে প্রস্তাব দিলেন।

ঘটনা আসলে ঠিকই। এদিকে সাথীর কাছে গেলেও একই কথা। পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। ধুস শালা প্রেম করাই হলো না।

লেখাপড়া বাদ দিয়ে ২০০৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দিই। সেখানেও অবিশ্বাস।

বন্ধুরা বলে, শালা ঘুস খাস।

কিন্তু কসম করে বলছি, আজ পর্যন্ত অন্যের দেয়া এক কাপ চা পর্যন্ত খেয়েছি কি না সন্দেহ। ডিউটিতে গেলে জনসাধারণকে বলি, ভাই দয়া করে দাগের এপাশে আসবেন না।

একজন প্রথমে দাগের উপরে, তারপর একজন এপাশে, এভাবে আসতে আসতে আমাদের শরীরের ওপর পড়তে চায়। কে শোনে কার কথা? মেজাজ ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভালো মন্দ না দেখে দুটো প্যাদানি দিলেই এলাকা ফাকা।

কর্মস্থলে হীরা নামে একটি মেয়েকে পছন্দ হয়। প্রথমে বন্ধুত্ব এবং পরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সম্পর্কটাকে প্রেমে রূপান্তরিত করি। এক সঙ্গে রিকশায় বেড়িয়েছি, মোবাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি। এক সঙ্গে রাত কাটিয়েছি। তার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছি। চরম তৃপ্তিতে তার মন ভরিয়েছি।

হীরা যশোর এমএম কলেজে দর্শনে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়তো। যখন ঘর বাধার জন্য একে অন্যের ভালো লাগা, মন্দ লাগা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন সে বললো, আমি পাস করে চাকরি করবো।

বললাম, না আমরা সুখের নীড় সাজাবো। তোমাকে সব সময় আমার কাছে রাখবো। বাসা নিয়ে থাকবো কর্মস্থলে, জীবন হবে ঐশ্বর্যময়।

কিন্তু না। সেখানেও অবিশ্বাস।

আমাকে ভালোবাসো না, সে বললো।

অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে অবশেষে প্রেমের সমাপ্তি ঘটলো। ভেবেছিলাম প্রেম করে বিয়ে করবো। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলো না।

অবশেষে বাবা-মায়ের পছন্দ এবং ইচ্ছায় রোজীকে জীবন সাথী করলাম। বাসর রাতে সে ঘরে ঢুকে প্রথমে আমার পা ছুয়ে সালাম করলো। দিলাম পুলিশি প্যাচ। লজ্জা ভাঙানোর জন্য বললাম, দাদি কি শুধু এটুকুই শিখিয়েছে? আর কিছু শেখায়নি?

রোজী বলল, কি?

বললাম, বাসর ঘরে ঢুকে স্বামীর ছয় জায়গায় চুমু দিতে হয়। না হলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।

কি আর করা? লজ্জামাখা মুখে সরল মনে শুরু করলো কাজ। সে কি শিহরণ।

এখন অবশ্য এ ধরনের কথা বললে নির্ঘাত ঝাড় পেটা, না হয় বেলুনের বাড়ি একটাও মেঝেতে পড়তো না। যা হোক ঘরের কথা নাইবা জানলেন।

তারপর বললাম, শাড়ি খুলে শোও।

রোজী শাড়ি খুলে পাশে রাখার চেষ্টা করলো। আমি শাড়ি হাতে নিয়ে ফ্লোরের এক প্রান্তে ছুড়ে ফেললাম। শুরু হলো তার কাপুনি। তার ঠোটে চুমু দিয়ে বুকে মৃদু চাপ এবং ঠোট চুষতে লাগলাম।

সে বললো, পবিত্র রাতে এসব নাকি করতে নেই।

বললাম, কি যে বলো। আমরা বিবাহিত। এ রাতে কাজ না করলেই পাপ হবে।

সে রাজি হলো।

আমার শাল কাঠের নৌকা তার ছোট্ট নদীতে নামাতে চাইলে উহ শব্দ করে কেদেই ফেললো। নিচ দিয়ে রক্তের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। আমার শাদা গেঞ্জি ধরলাম। ততোক্ষণে বিছানার চাদর শেষ। বাসর রাত শ্বশুরবাড়িতে হওয়ায় রোজীর বড়ভাই-এর বউ টের পেয়ে বললেন, ছোটভাই একটু আস্তে ধীরে খাও। ফুরাবে না।

খুব লজ্জা পেলাম।

ভাবী বললেন, মাছের রাজা ইলিশ আর জামাইয়ের রাজা পুলিশ।

বললাম, ভাবী, সেই কাজের রাজাও কিন্তু পুলিশ।

ভাবী লজ্জায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রোজীর সতীত্বের প্রমাণ সেই গেঞ্জিটা আজো শোকেসে রেখেছি।

সেই থেকে তার কথা, তোমার আগে থেকেই অভ্যাস আছে। না হলে বাসর রাতেই এমন করলে কেন?

আমার ডান হাত দিয়ে ওর ব্লাউজের একটা বোতাম খুলতে মাত্র পাচ ছয় সেকেন্ড সময় লাগতো। সেখান থেকে আরো অবিশ্বাস।

এতো দ্রুত কিভাবে ব্লাউজ খুলি?

অবিশ্বাসের এক পর্যায়ে জেএমবি বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার কারণে আমরা কোর্টের গেটে ডিউটি করতাম। মানুষের ব্যাগ-বডি চেক করে তবেই ঢোকাতাম।

বাগেরহাটের মেয়েরা খুব সুন্দরী ও সেক্সি। যে কোনো মেয়ের পেছনে দুদিন ঘুরলেই যে কোনো কাজ করা যায়। তবে সাবধান থাকতাম। আমরা এর ধারেকাছেও যেতাম না। চাকরি করা কঠিন হবে। কিছু বললেই তারা ঘাড়ে চেপে বসতে চায়।

যা হোক, সেদিন একজন কলেজ পড়ু য়া মেয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ চেক করতে চাইলাম। প্রথমে ইতস্তত করে পরে আইন মানতে ব্যাগ খুলে দেখালো। দেখি ব্যাগের মধ্যে আট-দশটি কনডম।

বললাম, কবে থেকে?

মেয়েটি লজ্জায় পড়ে গেল।

বললাম, আমি কি দুটি ব্যবহার করতে পারি?

সে বললো, কোথায় আসবেন?

আরে ধ্যাৎ, আপনাকে না। বাসায় বৌ আছে একটু টেস্ট করবো।

মেয়েটি দুটি কনডম হাতে দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল।

ও, বলতে ভুলে গেছি, রোজী তখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

বাসায় গিয়ে রোজীকে কনডমের কথা বলতে ভুলে গেলাম। বিধি বাম। রোজী কাপড় কাচতে গিয়ে কনডম পেয়ে আমার দিকে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে এগিয়ে আসতেই বললাম, সোনা কি হয়েছে?

কি হয়নি? আমার পেটে বাচ্চা। এ সুযোগে তুমি অন্য জায়গায় টাংকি মারো? আর তোমার ঘর করবো না।

তাকে যতোই বোঝাই কে শোনে কার কথা? কাপড়-চোপড় গোছাতে থাকে। বাড়ি যাবে। অনেক হাতে পায়ে ধরে পরিস্থিতি শান্ত করি।

আমার বন্ধু সোহেল ভালোবাসে জিনাতকে। আর সোহেলকে ভালোবাসে লাকি। অবশেষে বন্ধুরা মিলে সোহেল এবং জিনাতকে বিয়ের পিড়িতে বসাই। কিন্তু লাকি ফাকি খায়।

সেদিন ডিউটি না থাকায় বাগেরহাট স্টেডিয়ামে ক্লোজআপ ওয়ান তারকা নোলক, রাজীব ও বিউটিদের কনসার্টে বউকে নিয়ে গান শুনতে যাই।

ক্যামেরা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করছি এমন সময় লাকির সঙ্গে দেখা।

সে বললো, ভাই যা করেছেন ভালোই করেছেন। আমার চেহারা কি এতোই খারাপ? আমার মনে কি ভালোবাসা নেই?

এ কথা শুনে বউ উঠে দ্রুত রিকশায় বাসায় চলে গেল। শত পিছু ডেকেও ফেরাতে পারলাম না। অবশেষে বন্ধু সোহেলকে এনে তার ভুল ভাঙাতে হয়।

আসলে দোষ তার নয়। দোষ তার সরল মনের ভালোবাসার। আমিও যে তাকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। তাকে বুকে চেপে না ধরলে আমার ঘুমই হয় না। সারা রাত আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমায় বাচ্চা মেয়ের মতো। তার পেটের বাচ্চা যখন নড়ে ওঠে আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাই। পেটে চুমু খাই। আমার বাড়ি সিরাজগঞ্জ থেকে তিনশ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে বাবা-মা ভাইবোনকে ফেলে বাগেরহাটে চাকরি করি। বাবা-মাকে মনে পড়লে সে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।

সকালে আমাকে আদর করে ডেকে তুলে কপালে চুমু দেয়। তারপর ব্রাশ, শেভিং সরঞ্জাম এগিয়ে দেয়। গোসল বলতে বাথরুমে বসে থাকি। সেই গা ঘষে গোসল করিয়ে বাচ্চা ছেলেদের মতো শরীরে তেল, লোশন মেখে দেয়। আমি বাচ্চা ছেলের মতো আচরণ করি এবং তোর বুকে হাত দিই।

তুমি কি কচি খোকা নাকি? দুদু খাবে? খাও।

আমি সত্যিই খেতে চাই।

সে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিয়ে বলে, শখ কতো।

আজ আট বছর পর সেই প্রথম প্রেম তাসলিমা ভালোবাসা দিবসে ফোন করে বললো, আপনি ১৯৯৯ সালে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আজ রাজি হলাম।

বললাম, এতোদিন পরে কেন?

তাসলিমা বললো, এখন বুঝলাম আপনিই আমাকে বেশি ভালোবাসেন। তাই।

তাই কি হয়? এখন আমার সংসার হয়েছে। দুদিন পর বাবা হবো। তুমি তো সব জানো।

জানি। জানি। কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন তোমার জন্য আমার ঘরের দরজা চিরদিন খোলা থাকবে। ডিগ্রি পাস করেছি। চাকরি করবো। আপনি বাসায় বউ নিয়ে থাকবেন আর ছুটি হলে আমার কাছে আসবেন।

তা হয় না তাসলিমা।

তা হবে কেন? এখন বউই সব আমি কিছুই না। বেইমান প্রতারক!

এভাবে বেইমান প্রতারক হয়েই বেচে আছি। অনেক সময় জনসাধারণও ভুল বোঝে। এর উদাহরণ প্রথমেই দিয়েছি। হানিফ সংকেতের মতোই এই নিয়ে বেচে আছি আমি। আমাদের সন্তান পৃথিবীতে আসবে। ঘর আলোকিত হবে। আমার ভালোবাসা পাগল বউ খোকা-খুকুর আব্বু বলে ডাক দেবে। জীবন ধন্য হবে।

বাগেরহাট থেকে

ইন লাভ উইথ লায়লা

শেষ পর্ব

ভূমিকা : যায়যায়দিনের গত ভালোবাসা দিবসের ফাল্গুনী সংখ্যায় আমার একটা লেখা ছাপা হয়েছিল ইন লাভ উইথ লায়লা শিরোনামে। লেখা প্রকাশিত হবার পর অনেক পাঠক ব্যক্তিগতভাবে, কেউ যাযাদির মাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন লেখাটি অসম্পূর্ণ বলে। তাই একই শিরোনামে শেষ পর্ব হিসেবে বর্তমান লেখাটি পাঠালাম। এছাড়া এ ব্যাপারে পাঠকদের কাছে আমি ওয়াদাবদ্ধ।

লায়লা লিখেছিল তার বিয়ে। চিঠিটি যখন হাতে পাই তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার দুলাভাইয়েরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। অন্য জায়গা থেকে আংটি পরানো হয়েছে। বিয়ের তারিখ নির্ধারণ এমন কি কার্ডও ছাপানো হয়ে গেছে। এ অবস্থায় বিয়ে ভেঙে দেয়া অসম্ভব বলে লায়লার বাবা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এক রকম ভেবেই নিয়েছিলাম আমার সঙ্গে লায়লার বিয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বোধহয় অন্য রকম। এ ঘটনার ৩০ ঘণ্টা পর এলো লায়লার আম্মার টেলিফোন। তিনি বাকরুদ্ধ কণ্ঠে

বললেন, সম্মান নয়, আমার মেয়ের জীবন বড়। গত ৩০ ঘণ্টায় লায়লা এক ফোটা পানিও স্পর্শ করেনি। আপনারা আগামী ১২ তারিখ বিয়ের ব্যবস্থা করুন। লায়লার বাবাকে আমি রাজি করিয়েছি।

প্রিয় পাঠক, ঘটনার এখানেই শেষ হতে পারতো কিন্তু এই নাটকীয়তার ষোলকলা পূর্ণ হলো বিয়ের আগের রাতে।

১২ এপৃলের আগের রাত। আমার গায়ে হলুদ। বাড়ি ভর্তি মানুষ। হারানো মানিক ফিরে পাবার আনন্দে ভাসছি আমি। দুচোখ ভরা স্বপ্ন। লায়লার পছন্দমতো বিয়ের শাড়ি কিনেছি মোবাইল করে তাকে গোপনে জেলা শহরে ডেকে এনে। অন্যান্য বাজার করেছি সাধ্যের বাইরে। কারণ আমি স্বল্প আয়ের ছেলে।

ভাবী, বোন ও চাচিরা আমাকে হলুদ মাখাতে ব্যস্ত। কাজিনরা হাতে নকশা করে মেহেদির আল্পনায় লিখে দিচ্ছে L+K। ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের বাড়ির ছেলেটা এসে বললো, *ভাইয়া,* আমাদের টেলিফোনে লায়লাআপু আপনাকে কল করেছেন।

লায়লার টেলিফোন! খুশিতে লাফিয়ে ওঠার কথা কিন্তু কেন যেন বুকটা ধপাস করে উঠলো। কারণ লায়লা আগেই বলেছিল এনগেজমেন্ট রিং তারা ফেরত নেয়নি। শুধু আমিই নই পুরো বাড়ির সব কোলাহল কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সবার চোখেমুখে প্রবল জিজ্ঞাসা। দুরু দুরু বুকে টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে হ্যালো বলতেই অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে এলো লায়লার বাধভাঙা কান্নার আওয়াজ। বাকরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলতে পারলো, কায়েস কাল তোমরা বিয়ে নিয়ে এসো না, তোমার বিপদ হবে...। হঠাৎ এ সময় শুরু হলো প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। লাইনটা কেটে গেল। বহু চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারলাম না।

দুলাভাইদ্বয়ের ত্বরিত সিদ্ধান্তে একটা মাইক্রো বাস ভাড়া করে দ্রুত ছুটলাম লায়লাদের বাড়ির উদ্দেশে। লায়লাদের বাসায় পৌছলাম রাত দশটায়।

সেখানে গিয়ে জানলাম আগের ছেলেটি স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ দায়ের করে রেখেছে। চেয়ারম্যান-মেম্বাররা বাড়ি এসে লায়লার বাবাকে বলে গেছেন, বিয়ে আপাতত বন্ধ রাখতে। পরে মীমাংসা করে বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। আর সেই ছেলেটি স্থানীয় কিছু মাস্তান ভাড়া করে হুমকি দিয়ে গেছে আমার বিয়ে বহরে হামলা করে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

দুলাভাইয়েরা লায়লাদের প্রস্তাব দিলেন, মেয়েকে দিয়ে দেন আমরা নিয়ে বিয়ে পড়াবো। এ প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করলেন। সবার এক কথা, এই রাতে মেয়েকে পাঠালে পরদিন সারা এলাকায় রটে যাবে লায়লা পালিয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু আমার অভিভাবকরা নাছোড়বান্দা, হয় মেয়ে দেন না হয় নির্ধারিত দিনেই আমরা ছেলের বিয়ে অন্যত্র দেবো। কেননা আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া হয়ে গেছে। শুধু আমি ও লায়লা অজানা আশঙ্কায় পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। লায়লার বাবা কিছুতেই যখন রাজি হচ্ছিলেন না তখন বাধ্য হয়ে আমরা মাইক্রোতে উঠলাম চলে আসার জন্য। ঠিক এ সময় ভেসে এলো লায়লার বুকভাঙা আর্তচিৎকার। আমি দুলাভাইদের হাত চেপে ধরলাম। বললাম, প্লিজ কিছু একটা করুন। আমি লায়লাকে ছেড়ে কিছুতেই যাবো না।

তারা আবার ফিরে এলেন। আমি মাইক্রোতে বসে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। মাত্র কিছুক্ষণ পর দেখলাম লায়লা ও তার বাবা মাইক্রোতে এসে উঠছেন। প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া নিঃশ্বাস ছাড়লাম। আর দেরি নয়, সোজা এক টানে বাড়ি এসে পৌছলাম। ঝামেলার বিয়ে দেরি করা যাবে না। তাই সে রাতেই কাজি ডেকে আনা হলো। আমি যখন তিনবার কবুল উচ্চারণ করি তখন ঘড়িতে সময় নির্দেশ করছে রাত তিনটা ১২ মিনিট। তারপর ...।

তারপর শুধুই অভাব আর আনন্দের ইতিহাস।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে

মৃত খরগোশ

আনোয়ার কবির চৌধুরী

হঠাৎ একটু বসলাম। একটু ছায়া আছে এখানে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে দূরে পানিতে নোঙর করা অনেক পালের নৌকা আর স্পিডবোট। আগের তুলনায় এ বছর এগুলোর সংখ্যা আরো বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। অসলো ফিউরডের এ জায়গাটি বেশ সুন্দর। জায়গাটির নাম আক্কের বৃ। অনেক বড় নৌকার ওপর রেস্তোরা খোলা হয়েছে। এ রকম একটা ভাসমান রেস্তোরা থেকে সঙ্গীতের শব্দ কানে আসছে।

পানি ছাড়িয়ে দূরে একটা দ্বীপ নজরে আসছে, সেখানকার বাড়িগুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। একটা ফেরি জাহাজ অনবরত লোক নিয়ে ওখান থেকে আসা–যাওয়া করে। তাই জায়গাটা বেশ জমজমাট। আমার সামনে দিয়ে কয়েকটা স্বর্ণকেশী উদ্যম গতিতে হেটে গেল, অল্প বয়সীদের চলার ধরনই আলাদা। আমি সচরাচর এভাবে বসি না। কিন্তু এখানকার বেঞ্চগুলো খুব সুন্দর। মনে হয়, অসলোতে যতো পাবলিক বেঞ্চ আছে তার মধ্যে এগুলোই সবচেয়ে সুন্দর। তাই বসলাম, না বসলেও পারতাম। আসলে একটু আগে চলে এসেছি। আমার এখানে বাদলের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বিকেল চারটায়। এক ঘণ্টা হাতে আছে। অন্য জায়গায় হলে অবশ্যই এতো আগে আসতাম না, আক্কের বৃ বলেই এলাম। এখানের বাতাসটা নির্মল মনে হয়।

সময়টা কিভাবে কাটাবো ভাবছিলাম। একবার ভাবলাম একটা সফট আইসক্রিম খাই। দূর থেকেই দেখলাম বেশ বড় লাইন। পরে ভাবলাম কফি পান করি। শেষ পর্যন্ত পানির ধারের সেই কাফেটায় গিয়ে বসলাম। ওয়েটার মেয়েটা এসেই চোশত সুইডিশ ভাষায় যা বলার বললো। ইদানীং লক্ষ্য করেছি, নিসলোর প্রায় কাফে বা বারে সুইডিশ ওয়েটার। সেটা বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে তারা নরওয়েজিয়ান বলার চেষ্টা করে না, নির্বিকারে সুইডিশ ভাষা বলে যায়। ভাগ্যিস দুটো ভাষার বেশ মিল রয়েছে।

আমার কফি পান শেষ, চারটাও বেজে গেছে, বাদলের পাত্তা নেই। ভাবলাম উঠি, এমন সময় বাদলের ফোন এলো। গলায় বেশ উৎকণ্ঠা। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সে। তার বাড়িতে একজন ভাড়াটিয়া থাকতো বেলায়েত নামে, সে গুরুতর আহত। পুলিশই ফোন করেছে বাদলকে তৎক্ষণাৎ চলে আসতে, তাই সে ওখানে। আমাকে ওখানে চলে আসতে বললো কারণ ব্যাপারটা একটু সময় নিতে পারে।

বেলায়েত পাকিস্তানি, বয়স ত্রিশ। সে বাস চালাতো অসলোর পাবলিক পরিবহন সংস্থার। সে যে বাসটা চালাতো চার নাম্বার রুটে, সেটা নিয়ে রাস্তা থেকে সোজা একটা বাড়ির ওপর বাস চালিয়ে দিয়েছে আজ। বাড়ির দরজা, কাচ ভেঙে বাসটা ভেতরে ঢুকে গেছে। পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য, কিন্তু তাই–ই হয়েছে। এটা তার দিনের শেষ ট্রিপ ছিল। একেবার্গের নিরিবিলি পরিবেশের একটা রাস্তা দিয়ে যখন বাসটা চালাচ্ছিল, তখনই ঘটনাটা ঘটেছে। সব মিলে আটজন লোক আহত হয়েছে, সে নিজেও বেশ আহত। বাদলের কাছে এসব শুনে অবাক হলাম। এ রকম তো কখনোই ঘটেনি, তাই কৌতূহলও জাগলো মনে।

বেলায়েত ১৭ বছর বয়সে নরওয়েতে এসেছিল, জাতিতে পাঠান। এসে এক নরওয়েজিয়ান নারীর প্রেমে পড়েছিল। সে নারীর প্রেম ধীরে ধীরে দেশের ও পরিবারের পুরনো সব বাধন কেটেছিল। বিয়েও করেছিল তাকে, কিন্তু অনেক বিয়ের মতো তার সে প্রেমের বিয়ে টেকেনি। এক বছরের মাথায় সে নারী তাকে ফেলে আরেকজনের হাত ধরে চলে গেল। সে শোক সহ্য করতে বেলায়েতের অনেক কষ্ট হয়েছে। কিন্তু সে কখনো পুরোপুরি নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। কালেভদ্রে তার চোখে পানি গড়াতো, এখনো সে ভালোবাসে তার প্রথম প্রেমকে। এরপর আর বিয়েথা করেনি। শান্ত প্রকৃতির লোক সে, বেশি কথাবার্তা বলতো না।

এ দুর্ঘটনার খবর সঙ্গে সঙ্গে রেডিও, টিভিতে চলে এলো। পরিবহন সংস্থার কর্মকর্তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেল দুর্ঘটনার প্রাথমিক ভাষ্য দিতে, এছাড়া সাংবাদিকদের নানান ধরনের প্রশ্ন তো আছেই। পরিবহন সংস্থা

জানালো, তারা একটি উচু পর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করেছে যা এর কারণ নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে পুলিশের তদন্তে সাহায্য করবে। যারা আহত হয়েছে তাদের চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে।

কালক্ষেপণ না করেই তদন্ত কমিশন প্রথম সভা ডাকলো। কমিশনের নেতা হলেন বাস ডিভিশনের প্রধান টম নিলসেন। এছাড়া রয়েছেন যান্ত্রিক নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক বিভাগের প্রধানরা। বেলায়েতের ভাষ্য নিতে বেশ কয়দিন সময় লাগবে বলে পুলিশ জানালো। কিন্তু এরই মাঝে কমিশন মোটামুটি ধারণা পেতে চায়। পুলিশের সহযোগিতায় তারা একটার পর একটা কারণ দাড় করাচ্ছে এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ করছে।

যখন জানা গেল, গাড়িতে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না তখন প্রথমেই এলো অ্যালকোহলের ব্যাপার। বেলায়েত মদ খেতো না। সেদিন যারা তার সঙ্গে কাজ করেছিল ও কথা বলেছিল তাদেরও ভাষ্য, সে মাতাল ছিল না। রাস্তায় এখন কোনো বরফ নেই, তাই রাস্তার পিচ্ছিলতাও কোনো কারণ নয়। সে যে জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল সেখানে ভিড় ছিল না এবং সামনে থেকে কোনো গাড়িও আসছিল না। এভাবে একটার পর একটা কারণ বাতিল হয়ে চলছিল কোনো গ্রহণযোগ্য কারণই খুজে পাওয়া গেল না।

পরের অধ্যায় শুরু হলো একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণায়। প্রতিহিংসামূলক কোনো কারণে বেলায়েত সে বাড়ির ওপর গাড়ি তুলে দিয়েছে কি না সেটার বিশ্লেষণ করতেই এর সূচনা। দেখা গেল, বেলায়েত সে বাড়ির কাউকে চিনতো না। কিন্তু একটা রহস্য রয়েছে এর মাঝে। বাড়ির মালিকের সঙ্গে যে আরেক মহিলা আহত হয়েছেন, তিনি সেখানে বাস করেন না এবং তার স্ত্রীও নন। দেখা গেল ভদ্রলোকের স্ত্রী অন্য শহরে গিয়েছিলেন এবং তিনি আরেকজনের স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু কমিশন যখন নিশ্চিত হলো তাদের কাউকে বেলায়েত চিনতো না, প্রসঙ্গটার তখন সমাপ্তি ঘটলো।

বেলায়েতের শারীরিক ও মানসিক রিপোর্টেও তেমন সন্দেহের কিছু মিললো না। বাসের যাত্রীরাও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দিতে পারলো না। তবে একটা বিষয় কৌতূহলের উদ্রেক করলো। দুদিন আগে বেলায়েত একটা বার্তা পাঠিয়েছে তার মোবাইল ফোন থেকে যার ভাষা ছিল রহস্যজনক। সেখানে লেখা ছিল– আমি স্বপ্ন দেখি তোমাকে নিয়ে প্রতিদিন, অপেক্ষায় আছি কখন তুমি আমার বৌ হবে। অন্য কারণ যখন আর খুজে পাওয়া গেল না, সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এটার বিস্তারিত অনুসন্ধানের।

একটু সুস্থ হয়ে বেলায়েত যে কারণ বললো কেউই তা গুরুত্বরভাবে নিতে পারলো না। বেলায়েতের ভাষায়, সে একটা নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাওয়া মৃত খরগোশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল।

ভালো ড্রাইভার হিসেবে বেলায়েতের নাম থাকায় এটা গ্রহণ করা অনেকের জন্য ছিল কষ্টকর। তাই মোবাইলের সে মহিলার খোজ নেয়া আরো জরুরি হয়ে উঠলো। প্রথমে বেলায়েত মহিলার ব্যাপারে বলতে ইতস্তত করছিল। পরে বললো, সে নিনা নামে এ মেয়েকে চেনে প্রায় ছয় মাস। সে জার্মান এবং অসলোতে নার্স হিসেবে কাজ করে। বেলায়েত যে এলাকায় থাকে সেখানেই সে আরেক বান্ধবীর সঙ্গে থাকে এবং তারা মাঝে মধ্যে স্থানীয় শপিং সেন্টারে কফি পান করে। বেলায়েত তাকে খুব পছন্দ করে। সে বেলায়েতের ঘরেও কয়েকবার এসেছে, বেলায়েত তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে কিছুদিন আগে। সেদিন কাজ শেষে তার সঙ্গে বেলায়েতের সাক্ষাতের কথা ছিল।

কিন্তু বেলায়েতের তথ্যের সঙ্গে পুলিশের তথ্য মিললো না। মেয়েটি এসেছে বাল্টিকের একটি দেশ থেকে, সে কোথাও কাজ করে না। বেলায়েত যা জানে সেটা সত্যিকারভাবে বলেছে, কারণ মেয়েটি বেলায়েতকে সত্যি বলেনি। দেখা গেল, বেলায়েত ছাড়াও অনেকের সঙ্গে তার যোগাযোগ এবং কিছু কুচক্রী লোকের সঙ্গে ওঠাবসা আছে। ঘটনার আগে বেলায়েতের সঙ্গে তার কোনো বিবাদও হয়নি যার জন্য বেলায়েতের মেজাজ খারাপ থাকতে পারে। উপরন্তু সে খুব খুশি ছিল সেদিন এটা ভেবে যে, নিনা সেদিন তাকে হ্যা বলবে বিয়ের ব্যাপারে। এর বেশি আর কোনো তথ্য মিললো না এতে ঘটনারও সুরাহা হলো না। মৃত

খরগোশ ছাড়া অন্য কোনো কারণও বললো না বেলায়েত। বেলায়েতকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। সেখানেই ঘটনার সমাপ্তি।

বাদলের বাড়ির সামনের বাগানে বসে গৃল করছিলাম। বেলায়েত এখানে থাকে না এখন, ঘটনার পর সে নাকি দেশে বেড়াতে গিয়েছিল। কথা বলতে বলতে রাত হয়ে গেল। আকাশটা ছিল পরিষ্কার মনে হচ্ছিল খুব কাছে। হঠাৎ বেলায়েতের প্রসঙ্গ এলো। সে ঘটনার পর নিনার সঙ্গে বেলায়েতের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তার মানসিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। একদিন বাদল ঘরে এসে মোটামুটি অবাক। শান্ত লোকটিকে সে চিনতে পারছিল না। যে লোকটি সব সময় শার্ট-প্যান্ট পরে চলতো, সে তার সুটকেস থেকে দশ বছর পুরনো পাঠানি ড্রেস পরে বসে ছিল। এর আগে অনেক কিছু রান্না করেছিল, বিশেষ করে তার প্রিয় মাংস ভুনা ও কাবলিচানা। টেবিলে বিয়ারের বোতল, কয়েকটা ইতিমধ্যে খালি। বাদল আসতেই তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আজ তুমি আমার সঙ্গে খাবে।

বাদল জানে, পাঠানের আতিথেয়তা কাকে বলে, তাই আপত্তি করেনি। বাদল শুধু বললো, তুমি ঠিক আছো তো? সে বললো, আমি নিজেকে খুব মুক্ত অনুভব করছি। সত্যিই সে মুহূর্তে তাকে বেশ আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছিল। পরম যত্নে বাদলের প্লেটে এটা ওটা তুলে দিচ্ছিল। বিভিন্ন প্রসঙ্গের মাঝে বাদল হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি সত্যি খরগোশের জন্য সে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিলে?

পাঠানের অতিথি বৎসল হৃদয় এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু বাদলকে না বলে পারলো না সে মুহূর্তে। বিয়ারে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বললো, হ্যা আমি খরগোশের জন্যই করেছি। তবে আসল কারণটা আগে বলিনি। যেদিন আমার প্রথম স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে বাসে যাচ্ছিলাম, মনটা ছিল আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় ভরা। জীবনে এতো সুখ কখনো অনুভব করিনি। সে অবস্থায় হঠাৎ জানালা দিয়ে রাস্তার পাশে নজর পড়েছিল একটা নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাওয়া মৃত খরগোশের ওপর। দৃশ্যটা কখনো ভুলতে পারিনি। সে বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। আমি মাসের পর মাস প্রতি রাতে কাদতাম। মনে হতো আমিই সেই মৃত খরগোশ। তারপর এতো বছর পর আবার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার দিনে সে খরগোশ এসে হাজির হয়েছিল।

যখন বাদলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম তখন অনেক রাত। ভালোবাসার শক্তিবলয় কিভাবে আমাদের চেতন ও অবচেতন মনকে দোলা দেয়, এটা নিঃসন্দেহে আমার মাথায় ঢুকবে না। তবে ভালোবাসার শক্তি যে প্রচুর সেটা বিশ্বাস করতে হয়।

অসলো, নরওয়ে থেকে
kabirch@yahoo.com

আসেনি কখনো

কামরুল হাসান

কেউ কখনো কাছে আসেনি। ভালোবাসেনি। প্রস্তাবও করেনি। যদিও চেয়েছিলাম কেউ আমাকে ভালোবাসুক। বলতে বলতে আবেগ ছুয়ে যায় তাকে। দৃষ্টি কেমন উদাসীন। চোখের গোলাপি কার্নিশ, চিকচিক করে ওঠে। টরন্টোর রাজপথে প্রবল হাওয়ার সঙ্গে শাদা তুলোর মতো তুষার পড়ছে। মুখোমুখি বসে বলেছিলেন সহকর্মী ডা. অ্যালিনা জরজেস্কু।

মেডিকাল স্কুল শেষ করে সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে করবো। তখন আমি সাতাশ। আমি অনাথ। দশ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছে। Mitral Stonosis-এ মা মারা যান। একাকী ভালোবাসাহীন জীবন নিয়ে বড় হয়েছি। পারিবারিকভাবেই বিয়েটা ঠিক হলো। হোরিয়ার সঙ্গে খুব অল্প পরিচয়। তার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে। চার বছর স্থায়ী ছিল তাদের বিবাহিত জীবন। এর আগে আরো চার বছর ইউনিভার্সিটিতে

পড়ার সময় তারা লিভ টুগেদার করেছে। পেশায় আইটি হোরিয়া প্রতিষ্ঠিত বলেই বিয়েতে রাজি হয়েছিলাম।

টিপটিপ বৃষ্টিঝরা এক শীতার্ত বিকেলে বান্ধবীর সঙ্গে তার বাসায় গিয়েছিলাম। বুখারেস্টের শহরতলিতে বিশাল বাড়ি। বাবা গাইনোকলজিস্ট। মা কেমিকাল কর্পরেশনের ডাইরেক্টর। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার। প্রচুর সুস্বাদু খাবার ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। রোমানিয়ার সেই কমিউনিস্ট আমলে ফৃজভরা এতো খাবার খুব কম লোকের ঘরেই থাকতো। অত্যন্ত সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। আমি তার দ্বিতীয় স্ত্রী। সে আমার প্রথম স্বামী। নতুন জীবন শুরু হলো। মানুষের ধারণার সুন্দর জিনিসগুলো অনেক সময়ই পাল্টে যায়। ভুল প্রমাণিত হয়। মনে হয় মরীচিকা, জীবনে রঙ বদলে যায় কখনো কখনো। অত্যন্ত কটু হলেও নির্জলা সত্যি। আমার বেলায় তেমনি হতে দেরি হলো না।

প্রায়ই মেয়েদের ফোন আসতো। আমি কিছু মনে করিনি। তারপর ব্যাপারটা এতো বেড়ে গেল আমি বলতে বাধ্য হলাম, প্লিজ তোমার সব বান্ধবীকে ডাকো। আমি তাদের সুস্বাদু খাবার আর পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করি এবং সব শেষে হাতজোড় করে বিনীতভাবে বলি, যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। এবার তোমরা থাম। আমি তার স্ত্রী।

একদিন ভোরে বয়স্ক এক মহিলার ফোন পেলাম। কোনো রকম ভূমিকা না করে সরাসরি বললো, সে হোরিয়ার সন্তানের মা হতে যাচ্ছে। আমি প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। নিজেকে সামলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে অপকটে সব স্বীকার করে নিল।

হোরিয়া মেয়েটিকে কিছু টাকা দিয়েছিল অ্যাবরশন করার জন্য। কিন্তু সে শোনেনি। অশ্রদ্ধা আর ঘৃণায় মনটা ভরে গেল। ভালোবাসার অপর পিঠে ঘৃণাই লেখা থাকে। নিজেকে নিয়ে সব অহংকার টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। এ আমি কি করেছি।

মাকে খুব মনে পড়ছিল। স্বর্গ থেকে চুপি চুপি এসে মা আমাকে বলে গেলেন, তোমার জীবনের পবিত্রতা ও বিশ্বাস দিয়ে তার জীবনকে শুধরে দাও। ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

হাসপাতালে রোগী দেখার ফাকে অনেকবার কেদেছি। সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত নিলাম তার জীবন পাল্টে দেবো আমার ভালোবাসা, ধৈর্য, শক্তি ও সাহস দিয়ে। আমি তাকে দুটো সন্তান উপহার দিয়েছি। লিভিউ ও মারা। এক ছেলে, এক মেয়ে।

নর্থ ইয়র্কের এক বিশাল বাড়িতে আমরা একই ছাদের নিচে থাকি। শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত আসে এবং চলে যায়। আমি সুন্দর জমকালো পোশাক পরে তার অফিসের কৃসমাস পার্টিতে যাই। মৃদু হেসে বিনীত হাত মিলিয়ে বলি, আমি মিসেস জরজেস্কু। ভালোবাসা আমার বাড়ির করিডর হেটে বেড়ায়। ভুল করেও আমার ঘরে ঢোকে না।

ভালোবাসা দিবস? আমি কখনো সেলিব্রেট করি না। এমনকি কার্ড দিয়েও নয়। ভণ্ডামিকে দূরে রাখাই কি শ্রেয় নয়?

টরন্টো, কানাডা থেকে
quamrulhassan@hotmail.com

চাকরি

মাসুদা খাতুন

দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেছি ২০০১ সালে। অনেক কষ্টে টিউশনি করে খরচ চালিয়েছি নিজের পড়াশোনার এবং বাবা-মায়ের সংসারের। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সংসারে টিউশনির টাকা দিয়ে তাদের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্নের জোগাড় করা এবং তাদের সেবাযত্ন করে বেশ সময় কাটছিল। মেয়ে হয়ে জন্মেছি, তাই সমাজ ব্যবস্থা এভাবে বেশিদিন থাকতে দিল না। বিয়ে হয়ে গেল আমার। স্বামী বেকার যুবক।

শ্বশুরের ঘাড়ের ওপর চেপে বসে কাজের চেষ্টা করে যেতে লাগল। আমিও চাকরির চেষ্টায় প্রতিটা মুহূর্ত ব্যয় করে চলেছি এখনো। প্রাইমারি টিচার নিয়োগ পরীক্ষায় তিনবার ভাইভা বোর্ডের মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু চাকরি? সে তো সোনার হরিণ। আমার নেই মামা-খালু,নেই ঘুষ দেয়ার মতো সামর্থ্য। তাই তো আমাদের মতো মানুষের চাকরি হয় না। স্বামী আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। তাই আমার চাকরির জন্য সেও চেষ্টা কম করে না। যে প্রসঙ্গে আজ এই লেখা সেটার বর্ণনা এখান থেকে শুরু।

আমার স্বামীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাম ধরে নেওয়া যাক আবদুল্লাহ।

আবদুল্লাহ ভাইয়ের বড় দুলাভাই এ দেশের একজন গণ্যমান্য, স্বনামধন্য, শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তার নামের ডানপাশে ৮-১০টি বিভিন্ন ডিগ্রির নাম লিখতে হয়। আবদুল্লাহ ভাইয়ের আমন্ত্রণে তার দুলাভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাই ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেখানে দুলাভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা ও আলাপ পরিচয় হয়। তার একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে। দেশের বিভিন্ন শহরে ক্যাম্পাসও রয়েছে। আমার বাসস্থান দেশের অবহেলিত একটি বিভাগীয় শহরে। সম্প্রতি দুলাভাই আমার শহরে ইউনিভার্সিটির নতুন ক্যাম্পাস ওপেন করতে যাচ্ছেন। পার্টনারশিপের মাধ্যমে ক্যাম্পাসটি ওপেন হচ্ছে।

এখানে একাউন্টি-এ একজন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করা হবে। দুলাভাই মনে মনে আমাকে বাছাই করে আবদুল্লাহ ভাইয়ের মাধ্যমে আমার স্বামীকে খবরটি জানায়।

স্বামী এবং আমি এ খবরটি পেয়ে আল্লাহর অশেষ রহমতের অংশ হিসেবে ধরে নিয়ে দুজনে আনন্দে উল্লাস করলাম।

দুলাভাইয়ের শর্ত ছিল একটাই, অফিসে বোরখা চলবে না।

আমার শ্বশুরবাড়ি একটু রক্ষণশীল। তারপরও আমার চাকরির প্রয়োজনটা এত বড় ছিল যে, দুলাভাইয়ের শর্তটা মেনে নিয়েছিলাম।

দুলাভাই আমাদের বিভাগীয় শহরে ভিজিটে এলেন। ক্যাম্পাস ওপেনের কাজ কতদূর এগুচ্ছে তা দেখার জন্য। এর মধ্যে দুই মাস আগে আমার স্বামী ঢাকায় একটা প্রাইভেট ফার্মে ট্রেইনি হিসেবে চাকরি নিয়েছে। এটা দুলাভাই জানতেন। এক সকালবেলা আমার স্বামীর অনুমতিতে দেবরকে সঙ্গে নিয়ে দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য নির্ধারিত হোটেলে তার রুমে যাই। দুলাভাই আমাকে বোরখা পরা অবস্থায় দেখে প্রথমে তার বক্তব্য, তোমার তো এভাবে আসার কথা ছিল না।

আমি হেসে উত্তর দিলাম, আপনার অফিসে জয়েন করার পর আমি আর বোরখা পরব না।

দুলাভাইয়ের পার্টনারের সামনে বসেই এসব কথা হচ্ছিল আমাদের। এত বড় স্বনামধন্য একজন ব্যক্তি যিনি এক একসময় দেশের একেকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন তার সহাস্য আলাপে আমি এবং আমার দেবর মুগ্ধ। একটু পরে মি. পার্টনার তার কাজের জন্য বাইরে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমার দেবরকে দুলাভাই বাইরে যেতে বললেন, আমার সঙ্গে একান্তে আলাপ করার জন্য। শ্যালক বৌয়ের সঙ্গে একান্তে আলাপ না করলে কি আসল মজা পাওয়া যায়। এই বলে আমার দেবরকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর শুরু হলো দুলাভাইয়ের খোলামেলা আলাপ। চরিত্রবান, সভ্যদের ভেতরের পশুসুলভ আচরণ। দেখলাম তার আসল রূপ।

এত সময় তোমাকে আমার আসল কথাটা বলা হয়নি। আমার ইচ্ছা তুমি ঢাকায় চলে আস। ঢাকায় আমার চারটি ক্যাম্পাস। ওখানে তুমি যে পদে কাজ করতে চাও তোমাকে আমি সে পদেই চাকরি দেব। শুধু তুমি আমার কথামতো চলবে। আমি যখন যা চাইব তাই দিতে হবে। বোরখা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আরো কাপড় তোমাকে খুলতে হবে। আমাকে সময় দিতে হবে।

আমি অবাক হয়ে তার কথা শুনছিলাম। কোনো উত্তর দেয়ার শক্তি আমার ছিল না। ভাবছিলাম উনি হয়তো আমাকে যাচাই করার জন্য এ কথাগুলো বলছেন।

মুখ বুজে তার আবদারসমূহ শুনলাম আর তাকে প্রকৃতভাবে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। তার শেষ কথা হলো তুমি গৃন সিগনাল দিলে আমি তোমাকে ঢাকায় নেয়ার ব্যবস্থা করবো।

আমি জানতে চাইলাম আপনার তো আরো অফিসে মেয়েরা চাকরি করে, তাদেরও কি শর্ত সাপেক্ষে চাকরি দিয়েছেন।

জবাবে তিনি বললেন, আরে না। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে, তাই।

জানতে চাইলাম কখন থেকে আমাকে ভালো লেগেছে? এক বছর আগে যখন আপনাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন নাকি, আজ থেকেই?

বললেন, এক বছর আগে যখন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম।

আমি বললাম, দুলাভাই আমাকে ভাববার সময় দিন। তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি আমাকে ভেবে চিন্তা করে ফোন করে জানিও।

বললাম, আমি আপনাকে ফোন করব না। আমার সিদ্ধান্ত জানতে আপনিই আমাকে ফোন করবেন।

ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম দুলাভাই হয়ে এটুকু মশকরা হয়তো করতেই পারে। মনকে বোঝালাম চাকরির দরকার আমার বৃদ্ধ বাবা মায়ের তিনবেলা অন্নের জন্য। তাদেরকে দুশ্চিন্তামুক্ত করার জন্য। আমার স্বামীকে ফোনে সবকিছুই জানালাম।

ও বলল, চাকরিটা করার দরকার নেই। সমাজে কলগার্লের প্রতিষ্ঠাতা এদের মতো নরপিশাচের দল। হাজার হাজার মেয়ের জীবন নিয়ে খেলা করে এদের মতো দুঃশ্চরিত্র মানুষরা।

আমি আমার স্বামীকে বোঝালাম। দুলাভাই হয়তো আমার সঙ্গে রসিকতা করেছেন। উনি যদি সত্যি সত্যি ফোন করে আমার সিদ্ধান্ত জানতে চান তাহলে বুঝবো উনি আমাকে তার বিছানায় নিতে চেয়েছিলেন, তার রক্ষিতা বানাতে চেয়েছিলেন। আর যদি ফোন না করেন তাহলে বুঝবো উনি আমার সঙ্গে রসিকতা করেছেন।

আমি আসার পর দুলাভাই ঢাকায় রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। ঢাকায় পৌছানোর আগেই আরিচা ফেরিতে থাকা অবস্থায় সন্ধ্যাবেলায় ফোন করলেন।

আমি নামাজরত অবস্থায় থাকায় ফোন ধরতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর আবারও ফোন করলেন। জানতে চাইলেন আমার সিদ্ধান্তের কথা।

হৃদয়ের তিক্ততা-ঘৃণা থুথুর সঙ্গে গলে মিশে গিয়ে মুখ ভরে গেল। কল্পনায় থুথু ছিটালাম তার প্রতিষ্ঠিত মুখে। থুথু ছিটালাম তাদের মুখে যারা এ সমাজটাকে কলুষিত করেছে।

শুধু বললাম, আপনার চাকরি আমি করব না। আর কখনো আমাকে ফোন করবেন না।

কিন্তু আমার তো একটা চাকরির দরকার। কার কাছে যাবো, কাকে বিশ্বাস করবো এই সমাজে? বৃদ্ধ বাবা-মায়ের বর্তমান অবস্থা চোখের সামনে ভেসে উঠতে অজান্তে চোখ টলমল করে। গড়িয়ে পড়ে দুফোটা অশ্রু।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

এক দুঃখীনির গল্প

সামিনা হোসেইন

হঠাৎ করেই আমার বিয়েটা হয়ে গেল। ছেলের মা-খালা আমাকে দেখে পছন্দ করলেন। তড়িঘড়ি তারা বিদেশ থেকে ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে বিয়েটা দিলেন। আকদ করে ছেলে চলে গেল। আমাকে ঘটা করে অনুষ্ঠান করে তোলা হবে এই রইলো সম্মিলিত সিদ্ধান্ত।

নতুন বৌ হিসেবে আমার মনে অনেক রঙিন স্বপ্ন। সে চিঠি লিখবে, ফোন করবে, তার সঙ্গে কথা বলার সময় সবাই মুখ টিপে হাসবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আমার প্রতি তার তেমন আগ্রহ নেই। এই নিস্পৃহতার কথা অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানলাম তার জীবনের অন্য দুই নারীর কথা।

ঢাকায় থাকা এই দুই নারীকে দেখতে গেলাম আমি। প্রথমজন আমার স্বামীর কাজিনের দূর সম্পর্কের ননদ। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে মাস চারেক। আমার স্বামীই নাকি এর জন্য পাগল হয়েছিল এবং ভীষণ বিরক্ত করছিল।

ধরি, তার নাম শম্পা। আমার স্বামীকে শম্পার তৎকালীন প্রেমিক বর্তমানে স্বামী নাকি থ্রেটও করেছিল তাকে বিরক্ত করায়। শম্পা অত্যন্ত রূপবতী, রূপসচেতন, ধনী বাবার মেয়ে এবং ধনী স্বামীর স্ত্রী। রূপ এবং অর্থের দম্ভের এক অপূর্ব সমাবেশ রয়েছে তার চরিত্রে।

দ্বিতীয়জন আমরা ধরলাম মায়া। মায়ার সঙ্গে ঘটকালির উদ্দেশ্যেই আমার স্বামীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার এক বান্ধবী। মায়াকে দেখে চমৎকৃত হয়েছি। রূপের তেজ নেই, আছে স্নিগ্ধ মিষ্টতা, সঙ্গে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মুখে সারাক্ষণ এক চিলতে হাসি লেগে আছে। কেন জানি না, এ মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলাম। এই মেয়ে আমার স্বামীকে মুখের ওপর বলেছে সোজাসাপ্টা যে তাকে তার পছন্দ নয়। কিভাবে পরিচিত হই ভাবতে ভাবতে সাহস করে নিজেই কথা বলতে চলে গেলাম। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বদলে সে আমাকে কংগ্রাচুলেট করলো এবং ধানমন্ডির এক রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে গেল।

যতো পরিচিত হচ্ছি ততোই মনে হচ্ছে, আমার স্বামী এই মেয়েকে এতো সহজে যেতে দিল কিভাবে! শেষে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম।

উত্তরে বললো, আমার আত্মসম্মান বোধ বেশি টনটনে আর এক্ষেত্রে একদমই কম্প্রোমাইজ করি না। হাসি দেখে আমাকে নরম ভেবো না। প্রয়োজনে খুবই রূঢ় হতে পারি। তোমার বর আমাকে খুব নুতুপুতু মেয়ে ভেবেছিল। আর তাই তাকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছি।

এরপর মায়া জিজ্ঞাসা করলো, তুমি এখানে কি করছো? কেন আমার কাছে এসেছো?

আমি বললাম, দেখতে এসেছি কি কারণে সে আমার প্রতি আগ্রহ দেখায় না? তোমরাই কি সে কারণ?

মায়ার উত্তর আজো আমার মনে বাজে, তুমি তোমার মতো সুন্দর। কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। নিজেকে এতোটা ছোট ভেবো না বা ছোট করো না।

মায়াই হয়তো ঠিক। কিন্তু আজ পাচ মাস তার অপেক্ষায় আছি। এই ভেবে প্রতীক্ষায় থাকি, যখন সে আসবে তখন তাকে মমতা আর প্রেম দিয়ে আমি এতো ভালোবাসবো যে সে আর সব নারীর কথা ভুলে শুধু আমাকেই চাইবে, ভালোবাসবে।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন

প্যাচাল

ফৌজিয়া আক্তার

১.

এক রিকশাওয়ালা দ্বিতীয় বিয়ে করায় তার প্রথম বৌ মনের দুঃখে পাগল হয়ে যায়।

পাগল হয়ে সারা দিন রাস্তায় ঘুরে, নাওয়া খাওয়ার ঠিক নেই। এভাবে কিছু দিন যাওয়ার পর আবার সংসারে ফিরে আসে। এক সময় ঘর তার কাছে অতি আপন ছিল।

রিকশাওয়ালা তখন পাপের হিসাব করে। সে পাগলী বৌকে হাত ধরে কাছে বসায়। নিজ হাতে খাইয়ে দেয়। বস্তির কলপাড়ে নিয়ে সাবান দিয়ে গোসল করায়। কাপড় পরায়। জটপাকা চুলে তেল দিয়ে আচড়ে দেয়। পাগলী যে কয় দিন থাকে রিকশাওয়ালা এভাবে যত্ন করে। এক সময় পাগলী অস্থির হয়ে ওঠে। রিকশাওয়ালার ভালোবাসা ছুড়ে ফেলে সে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

২.

কার্তিক মাস্টার পটুয়াখালীর বটকাজল গ্রামে থাকেন। জাতে হিন্দু। তার স্ত্রী অদ্ভুত নিয়মে বাংলা বারো মাসের নাম গণনা করেন।

যেমন : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, (আমা গো বাড়ির সে) মানে কার্তিক।

তারপর যথাক্রমে অগ্রহায়ণ, চৈত্র বলে শেষ করেন।

কার্তিকের বৌ ভুলেও স্বামীর নাম মুখে আনেন না। তার ধারণা, স্বামীর নাম স্ত্রী বললে অমঙ্গল হয়।

৩.

এক নিঃসন্তান মহিলা প্রায় ডজনখানেক বিড়াল পুষতো। বিড়ালগুলো দেখতে ছোটখাটো বাঘের বাচ্চার মতো লাগতো।

মহিলা বিড়ালদের জন্য বড় পাতিলে ভাত রাধতো। সঙ্গে মাছ, মাংস, দুধ থাকতো। ভাড়া বাড়ির এক রুমে বিড়াল রাখা হতো। বিড়ালদের সে ছেলেমেয়ের মতো আদর করতো।

একদিন বিড়াল পালের মধ্যে একটি বিড়াল কি এক অসুখে মারা যায়।

মহিলার সে কি কান্না! চিৎকার করে কাদতে থাকে। মৃত বিড়ালটা শাদা কাপড়ে মুড়ে মাটি দিয়ে পুতে রাখে।

অনেকক্ষণ সেখানে থেকে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বাড়ি ফেরে।

৪.

ঝালকাঠির শেখেরহাটে আমার পৈতৃক ভিটা। সেখানে নদীর তীরে এক পীরের মাজার। নদীতে লঞ্চ, স্টিমার ও বিদেশি জাহাজ চলে।

নৌযান চলার সময় মাজার কাছাকাছি হলে সেখানে পীরের সম্মানে থামাতে হবে।

একবার এক সারেং বেখেয়ালে বা ইচ্ছা করে মাজারের কাছে লঞ্চ না থামিয়ে চলে যান। কিছুদূর যাবার পর আর তো লঞ্চ চলে না।

লঞ্চের যাত্রী ও সারেং আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকে। অনেক রাত, তার ওপর ডাকাতের ভয়। যাত্রীরা ভয়ে অস্থির। প্রায় চার ঘণ্টা পর লঞ্চ চলা শুরু করে।

একই নিয়মে এখনো নদীতে নৌযান চলে।

কথিত আছে, পীর সাহেব জীবিতকালে নদীর তীরে থাকতেন। বর্তমানে পীরের মাজার সংলগ্ন জায়গা আগের অবস্থায় আছে। তবে নদীর ওপাড় ভাঙে।

সারা বছর দরগায় ভক্তরা আসেন। ভক্তি ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে মাজারে টাকা-পয়সা দান করেন। ওই টাকা দিয়ে মাজারের উন্নয়ন কাজ ও গরিব লোকের সাহায্য করা হয়।

৫.

স্থানীয় স্কুলের নার্সারির এক মেয়ে তার ক্লাসরুমের এক ছেলেকে দেখিয়ে বলে, ম্যাডাম, ওই ছেলেটি বলে, সে নাকি আমাকে ভালোবাসে!

ম্যাডাম উত্তরে বলেন, ছেলেটি তোমাকে ভালোবাসতেই পারে। তোমার মা-বাবাও তো তোমাকে ভালোবাসেন। আমরাও তোমাকে ভালোবাসি।

মেয়েটি ঝটপট বলে ফেলে, ম্যাডাম, এ ভালোবাসা সে রকম ভালোবাসা নয়, ওটা অন্য রকম ভালোবাসা।

৬.

মার্কেটে গেলাম ঈদের কেনাকাটা করতে। অনেক ভিড়। কেনাকাটা শেষে দেখি এক লোক বকুল ফুলের মালা বিক্রি করছে। আমি ফুলের প্রতি দুর্বল। তবে বকুল ফুল বেশি পছন্দ করি।

বকুলের মালা হাতের কবজিতে জড়ালে মনটা জুড়িয়ে যায়। শুকিয়ে গেলেও ফুল থেকে এক রকম সুবাস ছড়ায়। তাও আমার প্রিয়। যাহোক, লোকটার কাছ থেকে দরদাম করে দুইটা বকুল মালা কিনলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই বিক্রি কেমন?

তেমন না।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনের অজান্তে বলতে থাকলাম, আসলে মানুষ কেন যে বোঝে না! ফুল কিনলে কতো লাভ। মন ভালো হয়ে যায় ফুলের ঘ্রাণে। মন ভালো থাকলে স্বাস্থ্য ভালো হয়। কেন যে লোকে ফুল কিনতে কার্পণ্য করে!

চমকে উঠলাম লোকটার কথায়।

আপা আর একটা মালা নেন। মালাটা হাতে নিলাম। বললাম, কেন?

তার সহজ উত্তর পয়সা লাগবে না। এটা ফাও।

ঠিকানা বিহীন

সর্বনাশা

রিক্ত

২০০৪ সালে আমার বিয়ে হয়। যাকে ভালোবাসতাম তার সঙ্গেই বিয়ে হয়। অবশ্য এই বিয়েতে আমার পরিবারের কেউ রাজি ছিল না। এমনকি আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরাও এই বিয়ে না করার জন্য আমাকে নানাভাবে বুঝিয়েছিলেন। আমি অন্ধ মোহের টানে তাদের কথা শুধু অমান্যই করিনি, যা করেছি তা রীতিমতো অপমানের শামিল। বিয়ের পর মুহূর্ত থেকে শুরু করে প্রায় এক বছর স্ত্রীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। আমি বলেছিলাম যেহেতু পরিবারের সবার অমতে বিয়ে করেছি সেহেতু একটু সময় নিয়ে দেখি তাদেরকে বিভিন্ন লোকজন দিয়ে বোঝানো যায় কিনা। কিন্তু শ্বশুর পক্ষ আমাকে ফাদে ফেলার মতো নানানভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। প্রায় পাচ বছরের ভালোবাসার সম্পর্ক থাকায় তাকে যেসব চিঠিপত্র দিয়েছিলাম তা আমার বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের দেখিয়ে আমাকে আরো হেয় করে দেন। চাকরিস্থলে এসে হুমকি দেয়, এমনকি আমাকে প্রধান আসামি করে আমার পিতা, বড়ভাই ও ছোটভাইকে জড়িয়ে কোর্টে মামলা দায়ের করে। মামলার আরজিতে বলা হয়, আমার স্ত্রী বাড়ি এসে আমার সঙ্গে সংসার করে। এ অবস্থায় আমরা এক লাখ টাকা যৌতুকের জন্য তাকে মারধর করে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বের করে দিই। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা সাজিয়ে স্ত্রী বাদী হয়ে মামলা করে। পরে ভরণ-পোষণ পাবার জন্য আরো একটি মামলা করে আমার নামে। এমনকি চাকরি কেড়ে নিয়ে আমাকে ও আমার বড় ভাইকে পথে বসানোর হুমকি দেয়।

এখানে বলে রাখি, আমার বিয়ের আগে থেকেই বড় ভাই এই বিয়ের ব্যাপারে রাজি ছিলেন না। বিয়ের সময়ও তিনি ছিলেন না। বিয়ের পরে তিনি আমাকে বলে দেন আমার ব্যাপারে তার কোনো কথা নেই। অর্থাৎ আমি এখন কি করব আমার স্ত্রীকে নেবো কি নেবো না, কোথায় থাকবো সেসব আমার ব্যাপার। আমি ওই মুহূর্তে ঠিক কেন যেন কিছুই বুঝতে পারিনি। কোনোদিন আমার পিতা ও বড় ভাইকে অমান্য করিনি, সেই আমি কেন যে বদলে গেলাম, অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাদের চরম অপমান করেছি এবং দুঃখ দিয়েছি, যা ওই মুহূর্তে বুঝতে না পারলেও আজ বুঝতে পারছি।

এখন আমি অপরাধের ভারে লজ্জিত, শঙ্কিত। বাড়িতে কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে গেলে মন থেকে বাধা আসে। বড় ভাই ও পিতার সঙ্গে কথাই বলি না বলা চলে। আজ কেন জানি হিসাব করতে চাই বার বার। কি করলাম, কেন করলাম, কি হবে আমার? এতো কিছুর পরও বড় ভাই আমাকে মেনে নিয়েছেন। পরিবারের সবার সঙ্গে স্ত্রীসহ বসবাস করছি। অথচ স্ত্রী যে মামলা করলো তার কোনো ভিত্তি নেই, সেই মামলা আবার প্রত্যাহারের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। তাদের যেন কোনো দায় নেই। বিয়ের সময় রেজিট্রি করা হয় না। মৌখিকভাবে বলা হয় দেনমোহর বিশ হাজার টাকা। অথচ মামলার বাদী হিসেবে আমার স্ত্রী বলল, কাবিননামা এক লাখ বিশ হাজার টাকা বলে উল্লেখ করে। বিয়ে পড়ানো মাওলানার ভুয়া স্বাক্ষরসহ একটি কাগজ এনে মামলা করে আমাকে ফাসাতে চাইলো। সামাজিক ও অন্যান্য সব বিষয় বিবেচনা করে পরিবারের সবাইকে রাজি করে তাকে এতো সবের পরেও বাড়ি নিয়ে আসি। বেশকিছু

দিন আমাদের বাড়িতে থাকার পর স্ত্রী তার বোনের বিয়ে উপলক্ষে বাড়ি যেতে চায়। আমার বড় ভাই তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কথা ছিল বিয়ে শেষ হলে ওইদিন সন্ধ্যায় ভাইয়ার সঙ্গে সে চলে আসবে। আমি চাকরির ব্যস্ততায় যেতে পারিনি। কিন্তু আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়ে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। সে আর ফিরে আসতে চায় না। আমার বড় ভাই তার পিতা-মাতা, ভাই, মামাসহ অনেককে অনুরোধ করেও ব্যর্থ হন। আমার বড়ভাইকে নানানভাবে অপমান করে। এলাকার কিছু অতি উৎসাহী মানুষের প্রলোভনে তারা লাফাতে থাকে। কিছুদিন পর বিষয়টি নিয়ে তাদের বাড়িতে বেশকিছু লোক নিয়ে বসা হয়। তারা সেখানে রূঢ় আচরণ করে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে রেজিট্রি করা হয় ষাট হাজার টাকায়। আমি স্ত্রীকে নিয়ে আসি।

ভালোবাসা করে বিয়ে করে এতো ঝামেলা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নিজের অপরাধবোধ আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। নিজের ওপর আজ প্রচণ্ড অপরাধের বোঝা ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছে। কোথাও একটু অনিয়ম দেখলে আমার অপরাধের কারণে হচ্ছে ভেবে নিতে কষ্ট হয় না। আমি সাজানো সংসারে ভাঙনের রেখাপাত করেছি। আমি সুখের ভুবনে এনেছি দুঃখের কালো থাবা।

আমি উপায় খুজে মরি, কি করে সবাইকে মুক্ত করে আমিও মুক্তির স্বাদ পাবো। এতোটুকু জ্ঞান যদি আমার থাকতো তাহলে আজ এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না। সর্বনাশা ভালোবাসার এক মোহে আজ আমি ভূপাতিত। সবার সুখ কেড়ে নেয়ার অধিকার আমার নেই। ভালোবেসে যা পেয়েছি তা আর আমার সহ্য হয় না। আমি কাউকে কিছু বলতে পারি না। যে যা বলে শুধু মুখ বুজে শুনে যাই, আর মনে মনে ভাবি আরো অনেক শুনতে হবে। এসব তো আমার প্রাপ্য। আমার জন্য অপেক্ষা করছে ধ্বংস, হতাশা, লাঞ্ছনা। ভালোবাসার সেই মানুষটিকেও আজ আমি মেলাতে পারি না। জানি না কোনো দিন এই যন্ত্রণা হতে মুক্ত হতে পারবো কিনা।

পাবনা থেকে

আম ছালা

মজহার

মনিকে ভালোবাসি যখন সে ক্লাস সেভেনে পড়ে তখন থেকেই। সম্পর্কে সে আমার চাচাতো বোন। খুব ভাব ছিল তার সঙ্গে। একজন আরেকজনকে তুই-তোকারি করতাম। এক সঙ্গে হলেই মারামারি খামচা খামচি চলতো। ভাইবোনদের মধ্যে সে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল আমার সঙ্গে। যদিও সে আমার চার বছরের ছোট। তার দুষ্টুমি খুব উপভোগ করতাম।

কথায় কথায় বলতো তোর দুলাভাই যদি দেখে তুই আমাকে মারছিস খুন করে ফেলবে। খুব ভালো লাগতো তাকে। ধীরে ধীরে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেললাম। সব সময় তাকে নিয়ে ভাবতাম। সে যখন ক্লাস নাইনে পড়ে তখন একদিন তাকে জানালাম আমার মনের কথা। খুব হাসলো, বিশ্বাস করলো না।

বললো, যা, তুই ফান করছিস।

অনেক কষ্টে বোঝালাম। সেই থেকে যতো দিন গড়ায় তাকে ততো গভীরভাবে ভালোবাসতে লাগলাম। আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো তার হাসিটা। দুই গালে টোল ফেলে কি সুন্দর করে হাসতো। যখন পাশাপাশি বসতাম তাকে জড়িয়ে ধরে পেটে হাত রাখতাম। মসৃণ লেপা উঠোনের মতো ছিল তার পেট।

আমাদের সুখ বেশি দিন স্থায়ী হলো না। বছর দুয়েক পর শুনলাম আমার বড়ভাই তাকে পছন্দ করেন। শুধু তাই নয়, বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাবা মায়ের ইচ্ছা তাকে বৌ করে আনবেন। আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। নির্বাক হয়ে গেলাম। চলতে লাগলো পারিবারিকভাবে আলাপ-আলোচনা। কিন্তু সে রাজি ছিল না। রাজি করানোর চেষ্টা করলো সবাই।

আমার সঙ্গে সে ফৃ ছিল বিধায় সবাই আমাকে বললো রাজি করানোর জন্য। আমি সুবোধ ছেলের মতো তাকে বললাম, ভাইয়াকে খুব ভয় পাই এবং কাকাকেও।

তার সঙ্গে সম্পর্ক হঠাৎ তিক্ত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মানসিক অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। পরিস্থিতি এমন হলো কাউকে কিছু বলতেও পারলাম না। সব ছেড়ে চলে এলাম কুয়েতে।

এখানে আসার পর কয়েকটি চিঠিতে তাকে অনুরোধ করেছি ভাইয়াকে বিয়ে করার জন্য। তখন মাত্র এইচএসসি পাস করেছি। চারদিক আধার হয়ে গেল। পরিবারের চাপে সে খুব অসহায় অবস্থায় পড়ে গেল। আমিও প্রবাসে।

তার দুর্বলতার সুযোগে আবির্ভাব হলো তৃতীয় পক্ষের। খুব সহজেই দখল করে নিল তাকে।

অন্যত্র বিয়ে হলো ভাইয়ার।

তারপর অনেক চিঠি দিলাম, কোনো উত্তর মিললো না।

পরে আমার পরিবারও জানলো আমার দুর্বলতার কথা। ভুল বোঝাবুঝি হলো। স্যাকৃফাইস করতে গিয়ে হারালাম সব কিছু।

আমার আমও গেল, ছালাও গেল।

কুয়েত থেকে

স্পর্শ

শুভ্র

আমি একজন মুসলিম, কলেজে পড়ি।

আমার সব ভালোবাসা, প্রথম অনুভূতি এবং শেষ চাওয়াটুকু একটা কৃশ্চিয়ান মেয়েকে ঘিরে। তার নাম বৃষ্টি। সে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। আমরা কলেজে চলাফেরা করার মধ্যে পাচ বন্ধু খুব ঘনিষ্ঠভাবে থাকি। ফ্লোরা কৃশ্চিয়ান এবং বৃষ্টি তার মামাতো বোন। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সেজান পয়েন্টে। প্রথম দেখায় আমার হৃদয়ের মধ্যে ড্রামের বড় বড় বাড়ির শব্দ শুনতে পাই। পরে জানতে পারি এ রকম শব্দ নাকি তার হৃদয়ের মাঝেও বেজেছিল। যাক সে কথা। ফ্লোরা পরিচয় করিয়ে দিল, সে আমার মামাতো বোন।

ফ্লোরাকে বললাম, তুই এতোদিন কি করছিলি। ফার্স্ট ইয়ার তো শেষ। সেকেন্ড ইয়ারও শেষ হতে চললো। আর তুই কি না এখন মামাতো বোনকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলি। যাকগে তবু তো পরিচয় করিয়েছিস।

সবাই যখন কথা বলতাম তখন মাঝে মধ্যে দেখতাম বৃষ্টি আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার সবাই কথা বলছে অথচ তুমি কথা বলছো না।

পরে সাহস করে তার হাতটা ধরলাম এবং আবারও বললাম। বুঝতে পারলাম সারা শরীর কাপছে তার এবং হাতও প্রচুর ঠাণ্ডা। পরে জেনেছিলাম আমাকে দেখেই নাকি তার এ অবস্থা হয়েছিল। সে দেখতে কেমন তা বললাম না। আমার কাছে অপূর্ব! পাঠকরা হয় তো বলবেন, *শালা তোর ইয়েকে তো তোর কাছে ভালো লাগবেই।*

আমার চোখ দিয়েই একটু দেখুন না। একেবারে কালনাগিনীর মতো চুল, বাশ পাতার মতো নাক, তুলতুলে গাল, কমলার কোয়ার মতো ঠোঁট, শঙ্খচিলের মতো হাত, মসৃণ গলা, উচ্চ বক্ষ। মেদবিহীন কোমর একেবারে ষোলকলায় বিকশিত। আমার মনে হয় সেকালের লিওনার্দো দি ভিঞ্চি আবার জন্ম নিলে মোনালিসার ছবি আকা ভুল হয়েছে মনে করে ওর ছবিটিই আকতেন। একদিন ফ্লোরাকে কানে কানে বললাম, আমি তো শেষ, তোর বোনও শেষ।

পরের দিন কলেজে এসে ফ্লোরাকে বললাম, আমি বৃষ্টির সঙ্গে দেখা করবো। সে আমাকে তাদের বাসায় নিয়ে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে কথা বললাম এবং তার প্রতি যে দুর্বলতা আছে তা জানালাম। আরো জানতে পারলাম সে নাকি আমার ছবি দেখেছে ফ্লোরার কাছে। তখন থেকেই আমার প্রতি দুর্বল।

সত্যিই বৃষ্টিকে তখন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি মনে হলো। তখন থেকেই বুকের বা পাশে এক ধরনের চিন চিন ব্যথা অনুভব করতে পারলাম। বুঝতে পারলাম তার চোখে কবিগুরুর চৈত্র মাসের সর্বনাশ দেখতে পেয়েছি।

তারপর একটু কথা। একটু স্পর্শের মধ্যে আমাদের ভালোবাসা বেড়ে উঠতে থাকে।

একদিন খবর পেলাম সে গ্রামের বাড়ি যাবে। যাওয়ার সময় দুজনেরই বিষণ্ণ মন। আমি বৃষ্টিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি রোজ অন্তত একবার হলেও তার সঙ্গে ফোনে কথা হবে। তারপর থেকে নিয়মিত ফোন করা হয় যদি না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে।

একদিন ফোনে জানলাম বৃষ্টির নাচের প্রোগ্রাম আছে ঢাকা শিশু একাডেমীতে। আস্তে আস্তে প্রোগ্রামের দিনটি এলো। ফ্লোরার কাছে জানলাম বৃষ্টি ফ্লোরাদের বাসায়ই উঠেছে। সেদিন ছিল আমার ইসলামিক স্টাডিজ পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়েই আমি ও আমার বন্ধু মিঠু ফ্লোরাদের বাসায় যাই। গিয়ে দেখি আমার প্রাণপাখি নাচের রিহার্সেল দিচ্ছে, সন্ধ্যায় তাদের নাচ। তাকে রাগানোর জন্য বললাম, নাচ না দেখতে গেলে কি হবে না? সে তো শুনে কেদেকেটে একেবারে অস্থির। অনেক অনুনয় বিনয় করে তাকে থামিয়ে বললাম, পৃথিবীতে সব হতে পারে। কিন্তু তুমি নাচবে আর আমি দেখবো না তা কি কখনো হয়?

বিকেলে আমি ও মিঠু নাচ দেখতে গিয়ে দেখি বৃষ্টি নাচের জন্য তৈরি তার আরো নৃত্যসঙ্গী নিয়ে। শাদা শাড়ি, লাল পাড়, কপালে লাল টিপ, মাথায় টিকলি, কোমরে বিছা আরো নানান জিনিস যা বলতে পারছি না।

তাকে একেবারে স্বর্গের অপ্সরীর মতো লাগছে যদিও তা কখনো দেখিনি। নাচের এক ফাকে ফ্লোরা আমাকে বললো, তোকে বৃষ্টি রিহার্সেল রুমে যেতে বলেছে। সেখানে গিয়ে যে সময় কাটালাম তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সেখানে গিয়ে বৃষ্টিকে কাছে টেনে নিলাম এবং বললাম, সুন্দর, অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে তোমার নাচ।

সে আমাকে বললো, তোমার পছন্দ হয়েছে? বললাম, এই নাচ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ নাচ।

তারপর আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে প্রথম চুমু। তারপরে কিছু সময় অতিবাহিত হলো কিছু চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে। যা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এক সময় দেখতে পেলাম তার বাবা আমাদের দেখতে পেয়েছেন। মনে মনে একটা গালি দিলাম, *শালা কাবাব মে হাড্ডি।* তারপরে ফেরার সময় হলো আরেক সমস্যা। কারণ ওরা মোট বারোজন তাদের আত্মীয়দের নিয়ে, আবার আমি ও মিঠু।

ফ্লোরার আম্মু বললেন, আমরা তো সব মিলে প্রায় পনেরো জনের মতো। এর মধ্যে পুরুষ হলে তুমি, মিঠু ও বৃষ্টির আব্বু। এক কাজ করো আমরা শাহবাগ পর্যন্ত রিকশায় যাই এবং তিনজন করে উঠি প্রতি রিকশায়।

সবাই রিকশায় উঠার পর ফ্লোরার আম্মু আমাকে বৃষ্টির রিকশায় উঠতে বললেন। আমি তো আমার জায়গা থেকেই এক লাফে ওই রিকশায় গিয়েছি। এ কাণ্ড মনে পড়লে এখনো হাসি পায়।

রিকশায় যখন উঠেছি তখন আমি উপরে সে নিচে। সারাক্ষণই তার গলা জড়িয়ে ছিলাম। একে তো রাত তারপর আবার আমাদের রিকশা সবার পেছনেরটা। সুতরাং আমাদের এসব কেউ দেখতে পায়নি।

রিকশাটা এতো তাড়াতাড়ি শাহবাগ পৌছালো যে আমার এখনো মনে পড়লে রিকশাওয়ালার প্রতি রাগ হয়। এর পর বাসে উঠলাম, বাসটা প্রায় খালি। তবুও ইচ্ছা করে পেছনে গিয়ে দাড়ালাম এবং বৃষ্টিকে একটি সিটে বসিয়ে তার পাশের সিটটা দখল করে দাড়িয়ে থাকলাম। কারণ বৃষ্টির আব্বু কোথায় বসে সেটাও খেয়াল করতে হবে। দেখলাম তার আব্বু সামনেই বসেছেন। আমি মহা খুশি। তাছাড়া পেছনে আলোও খুব কম।

আমরা আবারঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম এবং আবার সেই ঠোট কাপানো, হৃদয় কাপানো চুমু। সব সময় ঢাকায় এতো যানজট কিন্তু সেদিন বাস তো নয় যেন হেলিকপ্টারে চড়লাম এবং বাস থামার পর আমাদের ভালোবাসাবাসির সমাপ্তি ঘটলো সেদিনের মতো।

তাদের বিদায় দিয়ে বাড়িতে এলাম অনেক রাতে। পরের দিন আমার ইকনমিক্স পরীক্ষা। পরীক্ষায় শুধু বৃষ্টিকেই লিখেছি। পরীক্ষার পরে তাদের বাসায় গিয়েছি। কথা বলার এক সময় বোধহয় অনিচ্ছাকৃতভাবে একবার আমার হাত তার কোনো স্পর্শকাতর স্থানে লাগায় তার পুরো শরীর কেপে ওঠে। এটা নিয়ে আর ভাবিনি। কারণ এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। পরে যখন বৃষ্টিকে ফোন করি তখন সে এ কথা বলে। আমি শুনে তো অবাক। যাকে ভালোবাসি তাকে স্পর্শ করার অধিকার আমার আছে এবং তা সব জায়গায়। কেননা মন ও দেহের সমঝোতায়ই প্রকৃত ভালোবাসার বীজ লুকিয়ে থাকে। তাছাড়া ইচ্ছা করে তাকে এভাবে স্পর্শ করতে চাইনি। তাকে বলি, ঠিক আছে তোমাকে আর কখনো স্পর্শ করবো না। এ কথা বলে ফোন রেখে দেই। পরের দিন ফ্লোরার মাধ্যমে একটি চিঠি পাই। চিঠিটা তুলে ধরলাম যাযাদির পাঠকদের কাছে –

শুভ্র,

আমি তোমার স্পর্শ পেয়ে মোটেও রাগ করিনি। বরং খুব খুশি হয়েছি। তোমার স্পর্শ আমাকে ধন্য করেছে। তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না তো কে করবে? কারণ আমরা দুজনেই তো আমাদের নতুন প্রজন্মকে জন্ম দেবো। কথাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। এখন রাখি জান, আমার সোনা, আমার সন্তানের বাবা। ভালো থেকো। খুব ভালো। আমরা দুজন ও আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানের শুভ কামনায়।

তোমারই বৃষ্টি

তারপর থেকে রোজই তার সঙ্গে ফোনে কথা হয়। তাকে আমার হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। আমার বন্ধুরা বলে, ভুল করছি। সে কৃশ্চিয়ান। আমি বলি, কৃষ্ণ যদি রাধার গলায় মালা পরাতে পারে তাহলে আমি কেন পারবো না?

ঢাকা থেকে

সাথী

আবিদ হাসান

২০০০ সাল। অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেছি। বন্ধুদের সঙ্গে মাতাল সময় কাটিয়ে যাই যাই করেও কেন জানি যাওয়া হচ্ছে না। এমন সময় এলাকার কিছু ছোটভাই এক বন্ধুর মাধ্যমে জানালো, বানিয়াশান্তায় (পতিতা পল্লী) একটা নতুন মেয়েকে এনে জোর করে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করেছে। মেয়েটির নাম সাথী। বাড়ি নারায়ণগঞ্জ। সৎমায়ের বোন তাকে খুলনায় বেড়ানোর কথা বলে এখানে বিক্রি করে গেছে। মেয়েটি নবম শ্রেণীতে পড়ে। আরো শুনলাম, দেহ ব্যবসায় রাজি না হওয়াতে প্রথমে লাঠি দিয়ে মেরেছে। পরে নখের মধ্যে কাটা ঢুকিয়েও তাকে বাধ্য করতে পারেনি। অবশেষে তাকে না খাইয়ে রাখা হয়। দুইদিন না খেয়ে থাকার পরে সে ক্ষিধের কাছে নতি স্বীকার করে।

বানিয়াশান্তায় এখন তার একচেটিয়া বাজার। খদ্দেররা নাকি লাইনে দাড়িয়ে থাকে তাকে একবার চোখে দেখার জন্য।

আমার এক মাসের ছোট চাচাতো ভাই আতাউর রহমান আতা নদীতে বোট চালায়। সে প্রায়ই বানিয়াশান্তায় যায় প্যাসেঞ্জার নিয়ে। আতা মেয়েটিকে দেখেছে এবং তার এক বন্ধু মেয়েটির কাছে গিয়েছিল। মেয়েটি ছেলেটিকে ভাই ডেকে সেখান থেকে উদ্ধারের জন্য ছেলেটির পা ধরে কেদেছে। আরো বলেছে, সে নাকি অনেক লোককে উদ্ধারের জন্য মিনতি করলেও আজ পর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেনি। মেয়েটির কান্না দেখে সে কথা দিয়ে এসেছে তাকে উদ্ধারের একটা চেষ্টা সে করবে।

পতিতা পল্লী সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা জানে প্রতিটা পল্লী মাস্তান এবং পুলিশ দ্বারা কিভাবে আচ্ছাদিত থাকে। পুলিশ এখানে আইনের প্রয়োগ না করে ক্ষমতা ব্যবহার করে দালাল ও ভেড় য়া বনে যায়। তারা ভালো করেই জানে কিভাবে একটা মেয়েকে পতিতা বানাতে হয়। বলা বাহুল্য, প্রতিটি নতুন

মেয়েকে প্রথমে ভাড় য়া তারপর যথাক্রমে পুলিশ ও সাংবাদিক ভোগ করে। চাইলেই কেউ সেখান থেকে কোনো মেয়েকে উদ্ধার করতে পারে না। আর তাই ছেলেটি আমাদের শরণাপন্ন হয়েছে।

না। আমরা কোনো বড় মাস্তান বা ক্ষমতাধারী নই, নিতান্তই সাধারণ। তবে আমি ও আমার বন্ধুরা মনে করি কবি শুধু কলম ধরে সমাজ সংস্কার করবে না প্রয়োজনে ছুরি–বন্দুকও ধরবে। তাই কি মাস্তান কি ক্ষমতাবান, সবাই আমাদের কেমন যেন দৃষ্টিতে দেখে। এই কিছুটা টক মিষ্টি ঝাল টাইপ দৃষ্টি আর কি।

ছোটভাইদের কথায় কোনো ঝুকি নেয়া ঠিক হবে না ভেবে আমরা আলোচনায় বসলাম। বানিয়াশান্তায় যাওয়ার আগে বন্ধুরা আমাকে বললো, আবিদ, ভালো করে ভেবে দেখ। এতো বড় রিস্ক নিবি কি না। যদি পুলিশের কাছে ধরা পড়ি তারা হাজতে পুরবে। সঙ্গে মাস্তানদের নির্যাতন। তাছাড়া সবাই জানবে আমরা সত্যিই খারাপ। শুধু ভদ্রতার ভান করি। নারী সম্ভোগে এসে ঝামেলা বাধিয়ে এখন থানা হাজতে আছি। তাছাড়া মেয়েটিকে এনেই বা কি করবো? মেয়েটি যদি স্বজনদের কাছে ফিরে যেতে না চায়?

আমি বললাম, মেয়েটিকে তিনটি শর্ত দেবো। যদি সে শর্তগুলো মানে তবেই তার জন্য রিস্ক নেবো। প্রথম শর্ত সে বাড়ি যেতে চাইলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবো কিন্তু বাড়ির পরিস্থিতি যা–ই হোক আমরা আর কোনো দায়িত্ব নেবো না। দ্বিতীয় শর্ত সে বাড়ি যেতে না চাইলে তাকে এখান থেকে লেখাপড়া করতে হবে। এ ব্যাপারে আমার মিশনারিজ স্কুলের এক শিক্ষকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, মেয়েটিকে স্কুল হস্টেলে রেখে লেখাপড়ার সব ব্যবস্থা তিনি করবেন। তৃতীয় শর্ত হলো সে যাকে ইচ্ছে তাকে বিয়ে করতে পারবে। তবে সে যাকে বিয়ে করতে চাইবে সেই ছেলেরও তাকে বিয়ে করার মানসিকতা থাকতে হবে। তা না হলে অবশ্যই তাকে বাড়ি যেতে হবে।

মেয়েটি সম্পর্কে পরিকল্পনা স্থির করে আমরা তিন বন্ধু মিলে বানিয়াশান্তায় গেলাম। সামান্য পরিচিতি ও বড়দের স্নেহধন্য হওয়ায় এসব এলাকা যে কতোটা বিব্রতকর তা স্থানীয় ছেলেরা জানে। আতার বোটে করে খুব গোপনে মেয়েটি যে বাড়ি থাকে সেই বাড়ির সামনে নেমে দ্রুত চলে গেলাম বাড়ির পেছনে। সেখানে একটা বসার ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মেয়েটি এলো।

মেয়েটিকে দেখে বুঝলাম কেন মানুষ লাইন ধরে দাড়িয়ে থাকে তাকে ভোগের আশায়। হরিণের মাংসই যে হরিণের শত্রু! এই মাত্র সে একজনকে সঙ্গ দিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। পতিতালয়ের সাবলীলতা এখনো তাকে গ্রাস করতে পারেনি। সে কিছুটা জড়োসড়ো।

শহীদ খদ্দের সেজে তার রুমে গিয়ে বুঝিয়ে এলো কিভাবে তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবো এবং শর্তগুলোর ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করা হলো।

সাথী ভেবেছিল আজই তাকে নিয়ে যাবো।

যখন শুনলো আজকে আমরা এসেছি শুধু পরিস্থিতি ও রাতের বেলা কোন রাস্তা দিয়ে বের হবো তা পর্যবেক্ষণ করতে, তখন সে কিছুটা বিষণ্ন হয়ে গেল। ফিরে আসার পথে বলে এলাম, সাথী, এতোদিন যখন সহ্য করেছো আর এক দুইদিন একটু সহ্য করো। তোমাকে আমরা পরশু রাতে নিয়ে যাবো।

সে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু বললো, আমার কেবলি মনে হতো কেউ আমাকে উদ্ধার করবেই। এতো কষ্টের পরও বাচতে বড় সাধ জাগে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে আমার জীবন বিবর্ণ হলেও পৃথিবীটা তো বিবর্ণ নয়। আমি কি তার একটুও রঙ নিয়ে আবার বাচতে পারবো না? শরীর থেকেও মৃত্যুকে ভয় পাই নাকি জীবনকে ভালোবাসি জানি না। বেচে থাকতে মূল্য দিচ্ছি শরীর দিয়ে। আল্লাহর প্রতি অভিযোগ নেই। বৈচিত্রকে সমুন্নত রাখতে তিনি সচেষ্ট। তবে আমারও একটা সহ্যসীমা আছে। ধরুন আগামী পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবারই হবে আমার শেষ দিন। আপনারা এলে বেচে থাকার জন্য শেষ লোভটুকু করবো। তা না হলে শুক্রবার দিনটা তো শুভ রইলোই। আর কোনো কথা না বলে অপেক্ষারত এক কাস্টমারকে হাতের ইশারায় ডেকে ঘরে দুয়ার দিল।

বৃহস্পতিবার প্ল্যান করা হলো আমি খদ্দের সেজে সারা রাতের জন্য সাথীকে বুক করবো। আর রাতের যে কোনো এক সময় সুযোগ বুঝে বন্ধুরা সাথীর রুমের তালা ভেঙে আমাদের মুক্ত করবে।

রাতের বেলা প্রতিটি রুমের বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে রাখা হয়।

চাপা উত্তেজনা ও অস্বস্তি নিয়ে শেষ বিকেলে আতার বোটে নদী পার হয়ে এলাম বানিয়াশান্তায়। সঙ্গে ছয় বন্ধু কিছু লাঠি ও কয়েকটি রামদা নিলাম। সবাইকে বোটে রেখে আমি আর জামাল খদ্দের সেজে সাথী যে বাড়ি থাকে সেই মাসির কাছে গেলাম। দেখি মাসির পাশেই সাথী উদ্বিগ্ন অবস্থায় বসে আছে। আমাকে দেখেই যেন প্রশান্তিতে ভরে গেল সে।

দরদাম ঠিক করে সাথীকে নিয়ে যখন রুমে গেলাম তখন জামাল অন্য মেয়ের কাছে যাবার অজুহাতে পরিস্থিতি নিরূপণ করতে চলে গেল।

সাথীকে নিয়ে যখন রুমে ঢুকলাম তখন রাত প্রায় নয়টা। রুমে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে সাথী আলতো করে আমায় জড়িয়ে ধরে বললো, সারাটি দিন যে কতো শংকার মাঝে কেটেছে তা বলতে পারবো না। শুধু মনে হচ্ছিল তুমি আসবে না। অথবা তুমি আসার আগেই অন্য কেউ আমাকে সারা রাতের জন্য নির্বাচন করবে। বলতে বলতে কেদে ফেললো সে।

একটা ওড়না দেখিয়ে বললো, কাল ভোরে ওই ওড়নাটা গলায় পেচিয়ে ঝুলে পড়তাম।

তার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বললাম, শান্ত হও। এসেই যখন পড়েছি তখন এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাবোই। তার আগে আমাদের শর্তগুলো তোমাকে আর একবার মনে করিয়ে দিতে চাই।

আমার সব শর্ত মনে আছে। গত পরশু থেকে তোমাদের কথা যতো ভেবেছি ততোই আমি খেই হারিয়ে ফেলেছি।

কেন?

এই কয়েকদিনের বাস্তবতায় মানুষের প্রতি বিশ্বাস আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল। যখন দেখলাম শুধু আমাকে উদ্ধার করার জন্য মান–সম্মান বাজি রেখে বানিয়াশান্তায় প্রথম এলে তখন আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

তোমাকে কে বললো যে আমি ওই দিনই এখানে প্রথম এসেছি।

তোমার চাচাতো ভাই আতা কাল এখানে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে। সে বলেছে, তোমার বাবা–বোন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তুমি খুলনাতে এমএতে ভর্তি হওয়ার অপেক্ষায় আছো। তোমার সম্পর্কে আরো অনেক কথাই শুনলাম তার কাছে। শুনতে শুনতে মনে হয়েছে এই ছেলেটিই তো আমাকে উদ্ধার করতে আসবে। তুমি ছাড়া অন্য কেউ এলে পৃথিবীটা বড় গতানুগতিক হয়ে যেতো। তখন থেকেই মনের মধ্যে তোমার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি আমাকে ভাবালুতায় নিয়ে গেছে। মনে হয়েছে আমি আর একা নই।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, তোমাকে ঘিরে যে বোধের জন্ম হয়েছে তা কোনো প্রেমের চঞ্চলতা নয়, এ এক নির্ভরতা, এ এক বিশ্বাস। তাই তো আজ আর তোমায় আপনি বলে কিছুতেই সম্বোধন করতে পারলাম না।

হঠাৎ কথা থামিয়ে বলে উঠলো, সেই তখন থেকে কি বক বক করে যাচ্ছি, আমার মাথা মনে হয় ঠিক নেই। তোমার খাবার আনতে ভুলে গেছি। দাড়াও বলেই সে এক দৌড়ে হোটেল থেকে পরাটা আর গোশত ভুনা নিয়ে এলো। তারপর খাবার সাজাতে সাজাতে বললো, এ খাবারের টাকা কিন্তু আমার দেহ বিক্রির টাকা নয়। খুলনায় আসার সময় মা আমাকে দিয়েছিলো।

দেখলাম তার দুই গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তার একটি হাত আমার মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললাম, কেন নিজেকে অতো ছোট ভাবছো? কেন ভাবছো তুমি শেষ হয়ে গিয়েছো? তুমি আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে। লেখাপড়া করবে।

কেন প্রবঞ্চনা করছো। আমার জীবন আর কখনোই স্বাভাবিক হবে না।

কেন?

কারণ আমি এখন নষ্টা মেয়ে। ঝরা ফুল দিয়ে কখনো পূজা হয় না। তোমাদের শর্ত অনুসারে যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তুমি কি আমায় গ্রহণ করবে?

সাথীর জলভরা পুণ্যদৃষ্টির সামনে বড় অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। নিজের অজান্তে মুঠোর মধ্যে থাকা তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, সাথী, শরীর মসজিদও নয় মন্দিরও নয় যে পাক পবিত্রতার দোহাই পাড়ো। সত্যি কথা বলতে কি তুমি ছাড়া কোনো মেয়ের এতো কাছে কখনোই আসিনি। কিন্তু আমার জীবন সম্পর্কে অনেক ভাবি। এই ভাবনার মধ্যে একজন নারীর উপস্থিতি নিশ্চয় থাকে। যে শরীর থেকেও মানসিকভাবে শুভ্র। তবে হ্যা, আমার জীবনসঙ্গী যে হবে তার প্রতি আমার কিছু প্রত্যাশা তো থাকবেই। এই প্রত্যাশার ব্যাপারে আমি খুব কট্টর। এখানে আবেগ কাজ করে না। যুক্তি এখানে সুকঠোর।

প্রত্যাশাগুলো কি?

যেমন তাকে অবশ্যই গ্রাজুয়েশন শেষ করতে হবে।

আর?

হেসে বললাম, আর শুনে কি হবে? তোমার জন্য এই একটা শর্ত বহাল। তোমাকে আপন করে নিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। তবে অবশ্যই তোমাকে ডিগ্রি পাস করতে হবে এবং আমি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সাথী কি বুঝলো সেই জানে। তবে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল।

আমি তার আর একটু কাছে গিয়ে বললাম, প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে কাব্য করার মানসিকতা আমার নেই। আমি এখনো কোনো ভালোবাসায় জড়াইনি।

কেন?

এখন যাকে ভালোবাসবো আমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে। আর আবেগের বশে তাকে বিয়ে করে দুজনে শুধু শুধু কষ্ট করার পক্ষপাতী আমি নই।

তোমার চাচাতো ভাই ঠিকই বলেছিল। তুমি নাকি রসকষহীন।

হ্যা।

রাত তখন প্রায় দুটো। বাইরে জামালের সংকেত ধ্বনি পাওয়ার পর সাথী একটা চাবি দিয়ে বললো, আমি তালার চাবিটি চুরি করে রেখে দিয়েছি।

আমরা রুম থেকে বের হতেই সে আমাদের নিয়ে একটা গলি পথ অনুসরণ করে বললো, খুব সাবধান, পুলিশ কিন্তু টহল দিচ্ছে।

আমি এক হাতে সাথীকে ধরে অন্য হাতে একটা রাম দা নিয়ে এগুচ্ছি। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম মাস্তান পুলিশ যেই সামনে আসুক না কেন বিনা যুদ্ধে নাহি দেবো সূচাগ্র মেদিনী। শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই সাথীকে নিয়ে আতার বোটে উঠলাম।

সাথী আমার পাশে কবুতরের বাচ্চার মতো কাপছে। তাকে নিয়ে যখন মংলা এলাম তখন ফজরের আজানের সামান্যই বাকি। ভোর হওয়ার আগেই তাকে আতাদের বাসায় রেখে আমরা মামুনের স্টুডিওর ভেতর বসে পরিকল্পনা করলাম আমাদের করণীয়। কিন্তু ভোর হতে না হতেই বুঝতে পারলাম পানি বেশ ঘোলাটে হয়ে গেছে। মংলার যেসব গডফাদার সাথীর স্বাদ নিয়েছে তারা সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। যখন বুঝলাম তাকে মংলায় রাখাটাই বিপদ তখন নিয়ে গেলাম আমাদের গ্রামের বাড়ি।

হঠাৎ আতা ঘোষণা করলো সে সাথীকে বিয়ে করতে চায়।

বললাম, ভালো কথা কিন্তু সাথীরও মতামত থাকতে হবে।

মংলার পরিস্থিতি এমনই ঘোলাটে হয়ে গেল যে সাথী আমাদের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে গেল। তখন সব ভুলে গিয়ে আতার সঙ্গে সাথীর বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। কিন্তু কেন যেন আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। সাথীর মতামতেরও প্রয়োজন আছে। শহীদ ও জামাল বললো, সাথী বিয়ে বসতে না চাইলে তার দায়িত্ব নেবে কে? তাই তাকে বাই ফোর্স আতার সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। আর তাকে নারায়ণগঞ্জ পৌছে দেয়ারও রিস্ক নিতে চাই না। নারী অপহরণ কেস বড় সাংঘাতিক।

বললাম, বারে, সাথী তখন সত্য ঘটনা বলবে।
শহীদ বললো, পুলিশ বড় সাংঘাতিক। তারা টাকার জন্য নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী করে। আর নারায়ণগঞ্জে কে আমাদের শেলটার দেবে।
পরিস্থিতি যাহোক, সাথীকে ক্রীড়নক বানাতে মন আমার কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।
এ মনোভাবের জন্য তারা আমায় ভুল বুঝলো। তাছাড়া আমার প্রতি সাথীর দুর্বলতাটাও তারা প্রত্যক্ষ করেছে।
কিন্তু আমার মনোভাবটা না বুঝে বললো, সাথীর দায়িত্ব নিতে হলে তোকে একাই নিতে হবে। বড় বড় মাস্তান সব এক জোট হয়েছে, এখন অন্য কোনো ঝামেলা পোহাতে চাই না।
একটু ভাবার সময় নিয়ে বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙলো মামুন আর বাবুলের ডাকে।
বাবুল বললো, আবিদ ভাই, তারা সাথীকে আপনার গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে এসে আতার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে।
বুঝলাম আমাদের মধ্যেই দুটো দল হয়ে গেছে। কেউ আমার মতকে প্রাধান্য দিতে চায় কেউ শহীদ ও জামালের।
শেষ বিকেলে শহীদ মামুনের স্টুডিওতে বেজার মুখে ঢুকে বললো, আবিদ এর মধ্যে আমি আর নেই। খানকিটা আতাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। বলে প্রয়োজনে তাকে আবার পাড়ায় রেখে আসতে। তবুও সে আতাকে বিয়ে করবে না।
এ কথা শোনার পর আতার বাসায় যাওয়া মাত্র সাথী আমায় দেখে দৌড়ে এসে আমার কলার চেপে ধরে বললো, আমায় যদি রক্ষা করতে না পারো তবে পাড়ায় রেখে এসো।
সবার সামনে সাথীর এ আচরণ আমাকে ও সাথীকে দোষী সাব্যস্ত করে বিচার করা শুরু করলো।
আতার বাসার সবাই সাথীকে বললো, আবিদকে বিয়ে করার কথা ভুলেও মনে এনো না। তার বাবা একটা বাঘ। তোমার কথা শুনলেই আবিদকে ত্যাজ্য করবে। তুমি কি তার জীবনটা ধ্বংস করতে চাও? তোমাকে উদ্ধার করার এই ফল পাবে সে?
নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে। এই প্রথম পরিস্থিতি আমায় ভিকটিম করেছে। সাথীকে নিয়ে বিদ্রোহী হবো সে অবস্থা এখন নেই। এরই মাঝে মোবাইলে খবর পেলাম ভোরেই মাস্টার্সের রেজিস্ট্রেশনের জন্য খুলনায় যেতে হবে। জীবনে যা-ই করি না কেন মাস্টার্সটা সম্পূর্ণ করতেই হবে। আর এ ব্যাপারে কোনো আপস নেই।
তাই সাথীকে নির্জনে ডেকে বললাম, এখন তোমায় গ্রহণ করতে গেলে আমাকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমি চাই না আমার জীবনের কোনো অনিষ্টের জন্য তোমাকে দায়ী করি। সত্যি বলতে কি তোমার প্রতি আমার যে অনুভূতি তা ভালোবাসা নাকি অনুকম্পা সেটা আমার কাছে বেশ দুর্বোধ্য। তাছাড়া আতা খুব ভালো ছেলে। নামাজি। কয়েক পারা কোরআন মুখস্থ, সর্বোপরি সে তোমায় মনে হয় গভীরভাবে ভালোবাসে। তোমার ব্যাপারে তার আগ্রহটাই বেশি ছিল। আর আমার উপদেশ হলো, যে তোমাকে ভালোবাসে তাকে বিয়ে করো আর যাকে তুমি যা ভেবে ভালোবাসতে যাচ্ছো সে তা নাও হতে পারে।
আমার কথাগুলো নীরবে শুনে শুধু বললো, আমাকে আবার পতিতালয়ে রেখে আসা যায় না?
এ কথা শুনে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বলতে পারলো, পাড়াতে আমার তবু খদ্দের নির্বাচন করার স্বাধীনতা ছিল। মুক্তি পেতে গিয়ে সেটুকুও হারালাম। তারপর আমার হাত দুটো ধরে বললো, আমার এক রাতের ভালোবাসা আজীবনের পাথেয় করে প্রমাণ করবো বেশ্যারাও ভালোবাসতে পারে। আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলো এখনই যদি বিয়ে হয় তাহলে সে রাজি নইলে সে আবার পাড়ায় যাবে বা আত্মহত্যা করবে।

সে সন্ধ্যায় আতা ও সাথীর বিয়ে হলো, আমি নীরব দর্শক। একটা দম বন্ধ অবস্থা আমায় বিষণ্ন করে রাখলো। সবাই মনে করলো আমি সাথীর ভালোবাসায় পাগলপ্রায়।

অথচ আমার আবাল্য বন্ধুরা আমাকে বুঝতে চাইলো না, আমায় অপরাধী সাব্যস্ত করে দণ্ড দিল অসহায় মেয়েটিকে। আর আমি পরাজিতের মতো মেনে নিলাম সবকিছু।

তাদের সংসার খুব সুখের হয়েছে। একটা কন্যা সন্তান নিয়ে তাদের দিন ভালোই কাটছে। আতা আজ বুঝতে পেরেছে, আমি সাথীকে ভালোবাসিনি, শুধু চেয়েছিলাম তার একটা গতি হোক তার মনের মতো করে। তবে দুঃখ এই, সাথী আমায় দেখলে আজো কঠিন হয়ে যায়।

মংলা, বাগেরহাট

নীরব আকাঙ্ক্ষা

পুতুল

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একজন ভালো বন্ধু থাকে কিন্তু আমার কোনো বন্ধু নেই। কলেজে যাদের সঙ্গে পড়েছি তখন বেশ ভাব ছিল কিন্তু চাকরিতে এসে তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখতে পারিনি।

ভালোবাসার জন্য একদিন সবার অজান্তে বিয়ে করেছিলাম। স্বপ্ন ছিল ছোট একটা ছিমছাম সাজানো গোছানো সংসার, আমাদের মাঝে আসবে একটা মেয়ে। যার নাম হবে অর্পিতা। কিন্তু বিধাতা উপরে বসে হেসেছে আর বলেছে, তুমি যা চাও তা কখনো হবে না। তাই বোধহয় আমার স্বামী বাচ্চা চায় না।

আমাদের বিয়ে হয়েছে পাচ বছর।

বিয়ের পর প্রত্যেক স্বামীর একটা পরিকল্পনা থাকে যে, তারা কতো বছর পর বাচ্চা নেবে। অথচ এই পাচ বছরে একদিনের জন্যও শুনিনি যে, বাচ্চা দরকার।

আমার বয়স বাড়ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়ে একা হয়ে যাই। পারি না আমার বর্তমান অবস্থানের জন্য। সবাই হাসবে। বলবে, এতো ভালোবাসা কোথায় গেল? যাকে এতো ভালোবাসি, সে কেন এমন করে? ভালোবেসে বিয়ে না করলে হয়তো মাকে, পরিবারের কাউকে বলতে পারতাম। আজ এমন এক অবস্থা যে মন খুলে কাদতেও পারি না। কাদলে অফিসের সবাই প্রশ্ন করে, কি হয়েছে?

মৃত্যুর কথা ভাবতে পারি না আল্লাহর ভয়ে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, কখনো নিজে মৃত্যু কামনা করো না।

আমার চারপাশে সবাই একই প্রশ্ন করে বাচ্চা নিচ্ছি না কেন?

আজ লিখতে গিয়ে বার বার মনে হচ্ছে তাহলে কি ভালোবাসা শুধু বিয়ের আগের এক পর্ব? বিয়ের পর কোনো স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে না? সারা জীবন কি শুধু এভাবে নীরবে কেদে যাবো?

ময়মনসিংহ থেকে

শাশ্বত

জেলা সদরের মহিলা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার হিসেবে আমার শিক্ষকতা শুরু হয়েছিল। মানসিক সন্তুষ্টি না থাকায় ব্যাংকের সিনিয়র অফিসারের চাকরি ছেড়ে শেষ পর্যন্ত কলেজের অধ্যাপনায় নিয়োজিত হলাম। ক্লাসে পাঠদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় করার জন্য নিজেকে উজাড় করে মেলে ধরার চেষ্টা করতাম। ছাত্রীদের কাছ থেকে সন্তোষজনক প্রতি উত্তরও পেতাম। বেশ ভালো লাগতো। শিক্ষকতাকে উপভোগ করতে লাগলাম। একাদশ বিজ্ঞান ক্লাসে ছাত্রী ছিল মাত্র পনেরো জন। তাদের একজন শাশ্বতি। শাশ্বতি ছিল প্রভাবশালী হিন্দু পরিবারের একমাত্র আদুরে কন্যা। মিষ্টভাষী, সদালাপী, দেখতে সুন্দরী এবং গুরুভক্তিতে সবার চেয়ে এগিয়ে। ছাত্রী হিসেবে খুব মেধাবী না হলেও মেধাকে বিকশিত করার সব উপকরণই তার ছিল। সে ছিল খুব পরিশ্রমী, মুখস্থ বিদ্যায় পারদর্শী। সুন্দর হাতের লেখাসহ দ্রুত লেখার

দক্ষতা ছিল তার। বিভিন্ন গুণের জন্য কলেজের সব শিক্ষকের কাছে এক নামে পরিচিতি পেতে বেশি সময় লাগলো না।

আমি তার প্রাইভেট শিক্ষকও ছিলাম। অল্প দিনের মধ্যে একজন ভালো শিক্ষক হিসেবে শাশ্বতির মনে জায়গা করে নিতে সমর্থ হলাম। এ সুবাদে নির্ধারিত বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয়েও খোজ নিতাম এবং প্রয়োজন মতো গাইড করতাম। শহরের ছেলেদের কাছে শাশ্বতি ছিল একটি স্বপ্নের নাম। এজন্য শাশ্বতিকে অতিরিক্ত ঝামেলা বয়ে বেড়াতে হতো। এতে ভুল পথে পা বাড়ানোর আশংকাও থাকতো। আমি বুঝতে পারতাম কিন্তু কখনো এ বিষয়ে মুখ খুলতাম না। সম্ভাবনাময়ী শাশ্বতিকে বাজে পরিস্থিতি থেকে মুক্ত রাখতে এক সময় নিজেই উদ্যোগী হলাম। বলা যায় তার অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। এতে শাশ্বতি আমার ভূমিকাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলো।

শাশ্বতির অনুরোধে একদিন তাদের বাসায় গেলাম। তার মায়ের সঙ্গে পরিচয় হলাম। সত্যিকারের একজন ভদ্রমহিলার অকৃত্রিম স্নেহে সিক্ত হলাম। শাশ্বতির প্রতি সার্বিক দায়িত্ব ও ভূমিকার জন্য তিনি আমার প্রশংসা করলেন। শাশ্বতির বাবা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত পলিটিশিয়ান। তিনি পলিটিক্স নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। শাশ্বতির লেখাপড়ার খোজ খবর রাখার মতো সময় তার ছিল না। এ অবস্থায় শাশ্বতির মা তার মেয়ের লেখাপড়ার ব্যাপারে আমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। আমিও দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে চললাম। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় সে ভালো ফল করতে লাগলো। আমি সৃষ্টি সুখের আনন্দে উদ্ভাসিত হতে থাকলাম।

শাশ্বতি আমার কাছে ব্যাচে প্রাইভেট পড়তো। তাছাড়া অতিরিক্ত সময়ে তাকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ও দেখাতাম। টেস্ট পরীক্ষার আগে বাসায় পড়ানোর জন্য তার অভিভাবকের পক্ষ থেকে আমাকে প্রস্তাব দেয়া হলো। প্রথমে রাজি না হলেও শাশ্বতির অনুরোধে রাজি হতে হলো। বাসায় তাকে একা পড়াতে শুরু করলাম। এমনিতেই ছাত্রী-শিক্ষক হিসেবে আমরা একে অপরকে খুব পছন্দ করতাম। এবার তাকে একা পড়াতে গিয়ে আমরা বিশ্বস্ত মধুর সম্পর্কের সিড়ি বেয়ে একটু করে অসীমের দিকে ছুটতে লাগলাম।

একদিন শাশ্বতি কলেজ ছুটির পর আমার রুমে এলো। মনে হলো তার চোখে-মুখে একরাশ অভিমান। ডান হাতে দেখলাম হালকা রক্তে ভেজা শুকনো ক্ষত। তার এ ক্ষতের কথা জিজ্ঞাসা করতেই অভিমানগুলো বৃষ্টির মতো ঝরতে লাগলো। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তার হাতটা আমার হাতে তুলে নিয়ে ক্ষতস্থানে আলতো করে চুমু দিলাম। শাশ্বতি মাথা নিচু করে দাড়িয়ে রইলো। মাথাটা দুই হাতে তুলে ধরে ঠোটে চুমু দিতে লাগলাম। তারপর তাকে জড়িয়ে নিলাম বুকের মধ্যখানে। শাশ্বতি প্রতি নিঃশ্বাসে ঢেলে দিতে লাগলো তার অভিমানগুলো।

এর পর প্রায় প্রতিদিনই সে আমার রুমে আসতো। কোনোদিন শাশ্বতি আমার আদর না পেলে বা আমি তাকে আদর করতে না পারলে সেদিন আমাদের উভয়েরই দিনটা খুব খারাপ যেতো। তাদের বাসায় যখন তাকে একা পড়াতাম তখনো সুযোগ মতো চলতো চুমু খাওয়ার পালা। মাঝে মধ্যে শাশ্বতি তার চেয়ার ছেড়ে উঠে আসতো আমার কোলের ওপর। আমি ভয় পেলেও সে মোটেই ভয় পেতো না। প্রেমে সে খুব বিশ্বস্ত, আত্মবিশ্বাসী এবং নিবেদিত। সে ছাত্রী আর আমি শিক্ষক। সে হিন্দু, আমি মুসলমান। দুজনের মধ্যে এতো দূরত্ব নিয়েই বয়ে চললো প্রেমের নাও অজানা ঠিকানায়।

তবে শাশ্বতির লেখাপড়ায় ন্যূনতম অবহেলা প্রশ্রয় দিতাম না। রেজাল্ট ভালো করার দৃঢ় প্রত্যয় তার ছিল। এইচএসসি পরীক্ষায় সে কয়েকটি বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে সেন্টার ফার্স্ট হলো। তার অভিভাবকরা বেশ খুশি হলো। আমার প্রতি তাদের আস্থা বেড়ে গেলো। এদিকে শাশ্বতি ধর্মান্তরিত হয়ে আমাকে বিয়ে করবে বলে মন স্থির করে ফেলেছে এবং তাকে বিয়ে করার জন্য বার বার আমাকে তাগিদ দিতে থাকে। তাকে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করতো। তার অনুরোধ রাখতে পারতাম না বলে আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, ভীতুর ডিম ইত্যাদি বলে মিষ্টি করে গালি দিতো। আমি তার এই

আবেগকে শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারতাম না। কতোদিন একান্ত পরিবেশে আমাদের প্রেম যমুনায় উত্তাল তরঙ্গ দুই কূল ছেপে একাধারে আছড়ে পড়েছে, কিন্তু কূল ভাঙতে দিইনি।

এইচএসসি পাসের পর শাশ্বতি কোচিং করতে ঢাকায় গেল। তার এক বান্ধবীর মাধ্যমে পত্র যোগাযোগ হতো। ঢাকা থেকে বাড়িতে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো। একান্তে কিছু সময় দিতো। আমি আমার দেহে প্রাণ খুজে পেতাম। এভাবে এক বছর পেরিয়ে গেল। শাশ্বতি ঢাকায় ভর্তি হলো। লক্ষ্য করলাম ক্রমেই তার বুদ্ধি-বিবেচনায় পরিপক্বতা আসছে। সে বুঝতে পেরেছে, এ সম্পর্ক বাস্তবে রূপ দেয়া খুবই কঠিন। আমাকে পেতে হলে তাকে যে কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করতে হবে- তা না পাওয়ার বেদনার চেয়েও কঠিন। আমি কোনো দিন তার ওপর জোর খাটিয়ে কোনো কিছু আদায় করিনি। তার আবেগের সুযোগ নিয়ে কোনো ক্ষতি করিনি। এবার আমিও বুঝে গেলাম এ সম্পর্কের ইতি টানার সময় এসেছে। কেননা তাকে হজম করার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না।

এদিকে মেঘে মেঘে অনেক বেলা গড়িয়েছে। বিয়ের বয়সে লেগেছে ভাটা। আর অপেক্ষা নয়, আর পিছুটান নয়। এবার বিধ্বস্ত মন নিয়ে লেগে গেলাম বিয়ের পাত্রী খুজতে। তড়িঘড়ি করে একটা বিয়ে করেই ফেললাম।

বিয়ের এক মাস পর জানলাম সে এখনো আমার বিয়ের খবর পায়নি।

একদিন হঠাৎ করে শহরে দেখা। তাকে আমার সেই ব্যাচেলর রুমে আসতে বললাম। রুমে এসে আমার বিয়ের খবর শুনেই তার দুই গাল বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগলো। আমি ভেবেছিলাম তার বুদ্ধিতে পরিপক্বতা এসেছে। কিন্তু সে ধারণা উবে যেতে বেশি সময় লাগলো না। অনেক কান্নার পর একটু স্বাভাবিক হলে তাকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

শাশ্বতি বোধহয় জানতো না, সে এতো কষ্ট পাবে। এ কষ্ট ভুলে যাবার জন্য শাশ্বতিকে আরেকটি প্রেমে আটকে যেতে হলো। শেষ পর্যন্ত সেখানে বিয়ে। আমার বিশ্বাস, সে খুব ভালো আছে। শাশ্বতিকে শেষবারের মতো তার বিয়েতে দেখেছি। ভাবতে ভালো লাগে, আমার প্রেম শাশ্বতিকে জীবনের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে।

আমি তাকে তিলে তিলে গড়েছি। সে একজন মধ্যমানের ছাত্রী হয়েও এইচএসসিতে যে রেজাল্ট করেছিল তা ছিল তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। যেটা সে অকপটে স্বীকার করতো। পরবর্তীকালে সে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষাতেও ভালো রেজাল্ট করেছে। আমার ভালো লাগে তার সুখী জীবনের ভিত্তি গাথুনিতে আমার অবদান নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে বলে।

আমার ঘরে চাদের মতো ফুটফুটে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে সারাক্ষণ দ্যুতি ছড়ায়। তার পরও মাঝে মধ্যে শাশ্বতির মায়াবী মুখটা স্মৃতিসহ হঠাৎ ভেসে ওঠে। এক শাশ্বত অনুভূতি আমাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও আচ্ছন্ন করে রাখে।

নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঊর্মি

অনিক মল্লিক

সিংগাপুরের মানচিত্রের শিরা-উপশিরায় ঘুণপোকার মতো বসবাস করছে বাঙালি। এ দেশের আইন-কানুন নিয়মনীতি দুই পায়ে মাড়িয়ে বুক ফুলিয়ে রাস্তাঘাটে চলাচল করছে প্রতিনিয়ত। তাদের আচার ব্যবহারে এ দেশের জনগণ ক্ষুব্ধ হয় ঠিকই কিন্তু যখন চিন্তা করে সিংগাপুরের অতি চমৎকার কারুকাজের বিশাল অট্টালিকাগুলো নির্মাণ হয়েছে বাঙালিদের ঘামঝরা অক্লান্ত পরিশ্রমের কল্যাণে, ঠিক তখনি হিংসা আর বিদ্বেষ মনের মাঝেই কবর দিয়ে থাকে।

সেরাংগুন রোডের আংগুলিয়া মসজিদের সামনে যে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাটা সেখানেই পরোটা খাওয়া আমার রবিবারের অভ্যাস। কিন্তু আজ রবিবার নয়, দীপক ছুটিতে বাড়িতে যাচ্ছে। তার কেনাকাটায় কিছুটা

হেলপ করতে দীপক আমাকে আসতে বাধ্য করেছে। রেস্তোরাটার সামনে দিয়েই যাচ্ছিলাম আর পরোটাগুলো আমার দিকেই চেয়ে আছে। লোভ সামলাতে পারলাম না।

রেস্তোরায় ঢুকে খালি টেবিল দেখে বসে পড়লাম। ওয়েটারকে পরোটা আর ম্যাংগো জুসের অর্ডার লিখে দিলাম। আমার টেবিল থেকে দু টেবিল সামনে বসে একটি মেয়ে পরোটা খাচ্ছে। আমি নিখুতভাবে মেয়েটিকে দেখছি। এ রকম পরীর মতো সুন্দরী মেয়ে এর আগে কখনো দেখেছি কি না ঠিক মনে করতে পারছি না। ত্রিশূলের মতো নাক, ঠিক কমলার কোষের মতোই দুটি ঠোট রসে ভরপুর। অসহ্য রকমের সুন্দর দুটি চোখ। বুঝতে পারলাম ওই গহীন কালো চোখে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা নিরাপদ নয়। একবার তলিয়ে গেলে আর উঠে আসার পথ খুজে পাবো না কখনো। দুই কানে দুটো পাথরের দুল যেন আকাশ থেকে দুটি তারা খসে কানে এসে ঝুলে পড়েছে। জিন্সের প্যান্ট আর কালো টিশার্টে যা মানিয়েছে না আমার তৃষ্ণার্ত চোখ দুটি ছাড়া দেখেনি কেউ কোনো দিন। আমি বার বার মেয়েটিকে দেখছি, কিছুতেই চোখকে শাসন করতে পারছি না। আমি যে মেয়েটিকে দেখছি সে বুঝতে পেরেছে। মেয়েটির চোখের দিকে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলাম। কতোক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম বলতে পারবো না। শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম, গরম পরোটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

মেয়েটি বিল দিয়ে আমার সামনে এসে দাড়ালো। আমার বুক কাপতে শুরু করেছে, নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। মাথা নিচু করে আছি। এই মিস্টার আপনি আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছিলেন কেন?

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মেয়েটি বাংলায় কথা বলছে। আমি ভয় পাওয়ার চেয়ে অবাক হলাম বেশি।

মেয়েটি আবারও বললো, এই মিস্টার আমি আপনাকে বলছি।

মাথা উচু করে মেয়েটিকে বললাম, আপনি ইনডিয়ান না।

হ্যা– ইনডিয়ান, ইনডিয়ান হলেই এভাবে তাকিয়ে থাকতে হবে নাকি?

আমার খানিকটা হাসি পেল। বললাম, না আসলে–

মেয়েটি বললো, আসলে কি?

বললাম, প্লিজ বসুন। মেয়েটি আমার কথার অমর্যাদা করলো না। চেয়ার টেনে বসে পড়লো সামনেই।

এবার বলেন, কেন এভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

আমার খানিকটা লজ্জা লাগলো। আমি চুপ করে আছি।

মেয়েটি বললো, চুপ করে আছেন কেন, উত্তর দিন।

আমি বললাম, সত্যিই শুনবেন?

হ্যা বলুন।

পৃথিবীতে আপনার মতো এতো সুন্দরী আর কোনো দিন দেখিনি তো, তাই।

আপনি পৃথিবীর কয়টা দেশ ঘুরেছেন?

বাংলাদেশ আর এই সিংগাপুর।

আরো দেশ ঘুরে দেখেন তখন বুঝতে পারবেন আমি অতি নগণ্য।

পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আপনার মতো এতো সুন্দরী আর একটাও নেই, কখনো জন্মও নেবে না– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কথা শুনে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

আপনাকে দেখে যতো দূর চেনা যায় আপনি ইনডিয়ান শিখ জাতীয় তারা তো বাংলার অ পর্যন্ত বলতে পারে না আর আপনি...।

কেন, বাংলা বলার অধিকার আমাদের নেই নাকি?

অধিকার থাকবে না কেন। আপনাদের ইনডিয়ার পশ্চিম বঙ্গেই তো বাংলা প্রচলিত আছে।

আমি পশ্চিম বঙ্গেই থাকি এবং বাংলায় লেখাপড়া করি।

মেয়েটির কথা শুনে মনে হয় আমি আকাশ থেকে পড়লাম। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। মেয়েটি কি বলছে সব আবোল-তাবোল!

আপনি কি জানতেন পৃথিবীর কঠিনতম ভাষার মধ্যে বাংলাও একটি কঠিন ভাষা?

হ্যা, আমি জেনে বুঝেই এ ভাষায় লেখাপড়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছি। বাবা প্রথমে রাজি হননি। আমি বাবার একমাত্র মেয়ে, আমার ইচ্ছার কাছে সব কিছুই হার মানে।

পৃথিবীতে এতো ভাষা রেখে এ ভাষায় লেখাপড়া করার জন্য এতো উৎসাহী হলেন কেন?

বাংলা ভাষা চর্চা করেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি খেতাব অর্জন করেছেন এবং বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা বাংলা ভাষা রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তাই আমার বড় জানতে ইচ্ছা হয় এ ভাষার মধ্যে কি এমন রত্ন লুকিয়ে আছে।

মেয়েটির কথা আর আত্মপ্রত্যয় দেখে নিজেকে মনে হলো আমিও এক বাঙালি। কখনো মেয়েটির মতো করে ভেবে দেখিনি নিজের মাতৃভাষাকে।

কতো দূর শিখতে পেরেছেন বাংলা ভাষা?

কিছুই শিখতে পারিনি। পাঠ্য বইয়ের পাতা পড়ে মাধ্যমিক পাস করেছি মাত্র।

আমি বড় করে নিঃশ্বাস নিলাম এবং বললাম, আমরা এতোক্ষণ ধরে কথা বলছি অথচ আপনার নামটাই জানা হলো না।

আমি ঊর্মি সিং।

চমৎকার মানিয়েছে নামটি।

ঠিক বুঝলাম না।

ঊর্মি মানে ঢেউ আর আপনি ঢেউয়ের মতোই সুন্দর। আমার কথা শুনে মেয়েটির মুখ খুশিতে ভরে উঠলো এবং আমার নাম জানতে চাইলো।

আমি অনিক মল্লিক।

মল্লিক টাইটেলটা খুব শুনেছি ইনডিয়ায়।

পশ্চিম বঙ্গের বাংলা সিনেমার মধ্যমণিই তো রঞ্জিত মল্লিক।

ইয়েস, আপনি ঠিক ধরেছেন।

অনেক দিন পর একটা মেয়ের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারায় নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি খুব তৃপ্তি পেয়েছি।

আসুন না আরেক দিন দুজনে ঘুরে বেড়াবো সিংগাপুর। ঊর্মি হেসে বললো।

কম্পানির চাকরি করি, কাজ ফেলে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

না, আপনার ক্ষতি করে নিশ্চয়ই আপনার কাছে সময় চাওয়ার কোনো অধিকার আমার নেই। বাবা ব্যবসার কাজে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। বাবা থাকেন ব্যবসার কাজে ডুবে। আমি সারা দিন একা হোটেলে থাকি, কিছুই ভালো লাগে না। এই যে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যেভাবে সময়টা উপভোগ করলাম, গত দুই দিনের একা থাকার কষ্ট একেবারে মুছে গেছে, বিশ্বাস করুন। বর্তমানে আপনি আর বাবা ছাড়া আমার কাছে সিংগাপুরের সবাই অপরিচিত।

ঊর্মির মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম। বললাম, আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন?

নিউ পার্কে।

আগামী পরশু দিন তো ঈদ। ওই দিন আমার ছুটি আছে। আপনি বললে ঈদের দিন আসতে পারি। আমার কথা শুনে ঊর্মির চোখ-মুখ আনন্দিত হয়ে উঠলো।

বললো, ঠিক আছে তাহলে ঈদের দিনই, কথা দিলেন তো পরোটার বিল দিয়ে দুজনে রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে দেখি বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। বারান্দায় দাড়ালাম দুজনে। আমার হাতে ক্রীড়ালোক ম্যাগাজিন দেখে ঊর্মি অবাক হলো।

ক্রীড়ালোক সিংগাপুরেও আসে। জানেন, কলকাতায় এর আমি নিয়মিত পাঠিকা। ক্রীড়ালোকের প্রথম পাতায় ইনডিয়ান কৃকেট দলের নিউক্লিয়াস রাহুল দ্রাবিড়ের ছবি দেখে আরো বেশি খুশি হলো এবং আমাকে বললো, জানেন দ্রাবিড় আমার প্রিয় খেলোয়াড়।

বলুন না কোথায় পাওয়া যাবে এ ম্যাগাজিন। এটা আমার অবসরের সঙ্গী।

আপনাকে কিনতে হবে না, আপনি এটাই নিয়ে যান। আমি পরে দেখবো। ঊর্মি আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো। ততোক্ষণে বৃষ্টি অনেকটা কমে গিয়েছে।

চলুন না, হোটেলে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

না, আজ থাক অন্য দিন। আমার একটু জরুরি কাজ আছে।

তাহলে সেই কথাই রইলো। ঈদের দিন সকাল দশটায় ঠিক এই জায়গায়।

ঠিক আছে। ঊর্মি বাই বলে চলে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলাম।

রাত পোহালেই ঈদ। আকাশের বুকে আধখানা চাদ লেগে আছে ঈদের সাক্ষী হয়ে। তারারাও আছে চাদের পাশেই। গত রাতেও এক তিল ঘুমাতে পারিনি। ঊর্মি আমাকে ঘুমাতে দেয়নি। কিভাবে একটি মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হলো। সব কিছু স্বপ্নের মতো এক এক করে মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো। কি সুন্দর মুখশ্রী, কি অদ্ভুত কথা বলার ভঙ্গিমা, এসব আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে ভালোবাসা নামক পথের দিকে। মনকে শাসন করলাম, কি সব বাজে ভাবছিস তুই। এ তো হবার নয়, সবই ভুল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি।

ঘুম ভেঙে দেখি সকাল সাড়ে সাতটা। শিয়রের কাছে জানালা খুলে দিলাম। একটা দোয়েল পাখি লেবু গাছটার ওপর বসে আমাকে লেজ নাড়িয়ে অভিবাদন জানালো। আমি খুশি হলাম।

আজ ঊর্মির সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই মনটা কেমন যেন আনন্দে শিউরে উঠলো। তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে ক্লিন শেভ হলাম। আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হলো কি যে এক ভাগ্যবান! জিন্সের প্যান্ট আর শ্যাওলা কালারের টি শার্ট পরে নিজেকে ফিট মনে হচ্ছে। গভীর আনন্দ আর উৎসাহ নিয়ে পৌনে দশটায় রেস্তোরার বারান্দায় দাড়িয়ে রইলাম। অপেক্ষার প্রহর এতো দীর্ঘ হয়, জীবনে প্রথম অনুভব করলাম।

রেস্তোরার সামনে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম কিন্তু ঊর্মি আর এলো না। কি রকম যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া আমাকে চারদিক ঘিরে রেখেছে। বুকের মাঝে একটা চাপা কষ্ট এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি।

আজ দুই বছরের বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো মন থেকে ঊর্মিকে ভুলতে পারিনি। এখনো সেই রেস্তোরাটার সামনে আনমনা দাড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। হয়তো ঊর্মি আসবে – সে প্রত্যাশায়।

সিংগাপুর থেকে

পরিণাম

১৯৮৮ সাল। আমি তখন ঢাকার একটি নামকরা স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্র। বড়াই করছি না, মেধাক্রম অনুসারে প্রথম তিনজনের মধ্যেই ছিলাম। বৃত্তি নির্বাচনী পরীক্ষায় হলাম দ্বিতীয়। তখন একটাই টার্গেট– বৃত্তি পেতে হবে এবং অবশ্যই ট্যালেন্টপুলে। সকাল আটটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত হতো বৃত্তির কোচিং এবং বারোটা থেকে পাচটা পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস। সবকিছু ঠিকঠাক মতোই চলছিল।

বয়স তখন চোদ্দ পেরিয়েছে। হয়তো শরীরে জনন কোষ জন্ম নিতেও শুরু করেছে। কিন্তু আমি ছিলাম বরাবরই অন্তর্মুখী। মেয়েদের যতোদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতাম। মামার বিয়ে ঠিক হলো। বিয়ে হবে বগুড়ায় এবং শুধু বিয়ে পড়ানো হবে।

অক্টোবরের শেষের দিকে রওনা হলাম বগুড়া। বিয়ের রাতে ঘটলো সেই ঘটনা। আমি বিয়েবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখছি। হঠাৎ একটা রুমে গিয়ে দেখি কয়েকটি মেয়ে গল্প করছে। একজনকে দেখে চোখ আটকে গেল। মনে হলো, আকাশ থেকে একটা পরী নেমে এসেছে। একজন মেয়ে এতো সুন্দর হতে পারে, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। মনে হলো, কোনো ককেশীয় মেয়ে ভুল করে বাঙালির ঘরে জন্ম নিয়েছে। হয়তো

রবীন্দ্রনাথই ঠিক। তিনি যেমন বলেছেন, অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা। সেই মেয়ের রূপ এবং আমার কল্পনা এই দুয়ে মিলে আমি এক অপার্থিব আনন্দে বিভোর হয়ে রইলাম এবং সেই সঙ্গে করলাম জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তা হলো তার সঙ্গে কথা বলতে ভুলে গেলাম। এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থায় ফিরে এলাম ঢাকায়।

শুরু হলো জীবনের এক দুঃস্বপ্নের অধ্যায়। দিনের বেলা কোচিং ক্লাস করে বাসায় ফিরি। কিন্তু রাতে কিছুতেই ঘুম আসে না। ভেঙে গেল সব ধরনের জৈবিক শৃঙ্খল। মা তখনো বগুড়ায়। নানা অসুস্থ তাই ঢাকায় আসতে দেরি করছেন। বাবা একদিন আমার এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন আমার কি হয়েছে। আমি তখন আর আমার মধ্যে নেই। কি হয়েছে তা বোঝানোর সাধ্য আমার নেই। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো স্থানীয় এক ফিজিশিয়ানের কাছে। তিনি কি বুঝলেন কে জানে! তিনি আমাকে রেফার করলেন একজন সাইকিয়াট্রিকের কাছে। ওষুধ খেয়ে ঘুম হতে লাগলো। হারিয়ে ফেললাম ব্যক্তিত্ব। আমার মধ্যে শিশুসুলভ আচরণ ফিরে এলো।

এর মধ্যে আবিষ্কার করলাম আমার দেখা সেই অপরূপা ঢাকারই বাসিন্দা। নতুন আত্মীয়তার সূত্রে আসা-যাওয়াও শুরু হলো। কিন্তু কখনোই তাকে মন খুলে কিছু বলতে পারিনি। মনে হতো আমি শৃঙ্খলিত, বাক্সবন্দী। অসুস্থতার কারণে বৃত্তি পরীক্ষা এমনকি বার্ষিক পরীক্ষাও দেয়া হলো না। তবু অতীত ফলাফল দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে ক্লাস নাইনের এ সেকশনে ঠাই দিলেন।

শুরু হলো নতুন যুদ্ধ। বছরের কিছু সময় সুস্থ থাকি এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাই। কিছু দিন পর পর অসুখ প্রত্যাবর্তন করে। শুরু হলো ডাক্তার বদল। ক্রমান্বয়ে ঢাকা শহরের বড় সব ডাক্তারকে দেখালাম। কিন্তু ফলাফল শূন্য। এক বছর ড্রপ দিতে বাধ্য হলাম। ১৯৯২ সালে আপাত ভালো ফল নিয়ে এসএসসি পাস করলাম। আপাত বললাম এই কারণে যে, আমার পেছন দিকের ছেলেরা বোর্ড স্ট্যান্ড করেছিল কিন্তু আমি তা পারিনি।

সেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। আমি জানি না সে কখনো আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল কি না। কিন্তু আমি নিজেকে প্রকাশ করবো কি করে! আমি যে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। ধীরে ধীরে আমার সৃজনশীলতা হ্রাস পেতে লাগলো। মেধা হারালো তার প্রখরতায়। কোনোমতে স্টার পেয়ে এইচএসসিতে পাস করলাম। ভর্তি হলাম বুয়েট ভর্তি কোচিংয়ে। কিন্তু বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার সপ্তাহখানেক আগে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এবার আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গেলাম। তার রেফার করা একজন আলেমের কাছে তদবির নিতে গেলাম। তিনি যা বললেন তা হলো, ১৯৮৮ সালের নভেম্বরের দিকে আমাকে একটি গন্ধহীন ফুল শোকানো হয় যা আমার রোগের জন্য দায়ী।

এরপর গাজীপুরের একটি আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি থেকে তড়িৎ কৌশলে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করি এবং বর্তমানে একটি টেলিকম কম্পানিতে কর্মরত আছি। আফসোস এজন্য যে, আমার স্কুল সহপাঠীদের অনেকে যখন আমেরিকায় প্রফেসর বা সফটওয়্যার ডিজাইন করছে, তখন আমি একটি পিএসটিএন অপারেটর কম্পানিতে পানসে চাকরি করছি।

আমি এখনো বড় একাকী, নিঃসঙ্গ। আমার জীবনটা তো অন্য রকমও হতে পারতো!

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
mailtomugdho@yahoo.com

মোবাইল প্রেম

সাথী

নাম সাথী। ২০০৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার জন্য রাজশাহীতে কনটেস্ট কোচিং সেন্টার-এ ভর্তি হলাম এবং অর্কিড ছাত্রী নিবাসে উঠলাম। আমাদের তিনজন মেয়ের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমাদের হস্টেলের প্রায় সব মেয়েরই ফোন আসে। ফোনে

কথা বলা শেষ না হতেই মোবাইলে ডাক আসে, তারপর ডেটিং... কিন্তু আমাদের তিনজনের কেউ নেই। তাই আমাদের খুবই মন খারাপ। আমি তাদের বললাম শোন, আমরা Pen friend করি। তারা বললো, ঠিকানা কোথায় পাবো? বললাম, টেনশনের কারণ নেই, ঠিকানা জোগাড় করে দেবো। তারপর এলো চিঠি লেখার পালা। আমরা তিনজন এক সঙ্গে চিঠি লিখলাম। যার কাছে লিখলাম তার নাম অপু, বুয়েটে পড়ে। এই সেই অপু যাকে নিয়ে আমার আজকের এ লেখা।

ইতিমধ্যে রেজাল্ট হলো। আমাদের তিনজনেরই রেজাল্ট মোটামুটি ভালো।

আমি চিঠিতে হস্টেলের মোবাইল নাম্বার দিয়েছিলাম। দিনটি মনে নেই। তবে রোজার দিন সকাল সাড়ে সাতটার মতো হবে। তখন আমার ডাক পড়লো। ফোন এসেছে। সে রাতে তিনটা পর্যন্ত পড়াশোনা করে সেহরি খেয়ে ফজরের নামাজ আদায় করে সবেমাত্র ঘুমিয়েছি, এরমধ্যে ফোন। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ফোন ধরলাম।

সে বললো, আমি অপু, ঢাকা থেকে বলছি। আমি বকতে নিবো। তখন মনে হলো, আমি তো পেন ফ্রেন্ড করতে চেয়েছিলাম। তারপর অনেক কথা হলো। আমি তো মহা খুশি। তারপর বান্ধবীদের বললাম। তাদের মন খারাপ।

বললাম, দেখ তোদেরটাও আসবে। ঈদ তো, তাই হয়তো বাড়ি গেছে। পরে তাদেরটাও এসেছিল।

অপু বলে সে চিঠি লিখতে পারবে না। মোবাইল বন্ধু হবে। কিন্তু আমি বললাম, মোবাইলেও কথা হবে, চিঠিতেও হবে। কিন্তু তার একই কথা। তাই আমাদের বন্ধুত্ব ওখানেই শেষ।

আমি একটু অহংকারী টাইপের মেয়ে। রাজশাহী ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিলাম। বাসায় এসে ভাবলাম অপুকে একটা কল দেবো। কিন্তু আমাদের মোবাইলে ৭.৮৫ টাকা আছে। ম্যাসেজ কিভাবে পাঠাতে হয় তাও জানি না। বাইরে বের হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই ভাবলাম মিসকল দিই। দিতে দিতে যখন কলব্যাক করবে তখন বলবো আমি সেই সাথী। মিসকল দিলাম। ফোনটা ছিল বাসার, মানে বাসাতেই থাকতো সব সময়। আমরা যে যখন সুযোগ পেতাম রিসিভ করতাম।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দেবো। তাই রাত বারোটায় পড়ছিলাম।

হঠাৎ মিসকল। অপু নাম আগেই সেভ করে রেখেছি। আমিও মিসকল দিলাম। সে কলব্যাক করলো।

মনে মনে ভাবলাম তা তাকে বলবো, আমি সেই সাথী। কিন্তু রিসিভ করে হ্যালো বলতে না বলতেই সে বলে কি, আপনি কি প্রসটিটিউট?

আমি তো হা! কি বলবো, ভেবেই পাচ্ছি না। রাগে শুধু গা জ্বলে যাচ্ছে। তারপর লাইন কেটে দিয়ে ভাবছি, যে টাকা আছে তা দিয়ে কলব্যাক করে বকবো। কল দেবো সে মুহূর্তেই অন্য নাম্বার থেকে মেয়ে কণ্ঠের একটা ফোন এলো।

সে বললো আপনার নাম কি, কিসে পড়েন? আপনি কি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন?

আমার গা রাগে জ্বলে যাচ্ছে তার ন্যাকামো মার্কা প্রশ্নে! আমি একটু রেগেই বললাম, না।

ছুড়ি বলে কি! ও আপনার শুধু ছেলেদের মিসকল দেয়ার শখ আর বকা খেতে ভালো লাগে, তাই না?

আমার তো মেজাজ আরো মানে ১০০^{o} ওভার! তারপর লাইন কেটে দিয়ে ইচ্ছা মতো বকলাম। কি যে বকেছি মনে নেই।

পরদিন সকাল থেকে আবার মিসকল। তারপর দশটা এগারোটার দিকে ফোন ফ্যাক্সের দোকানে গিয়ে বকে এলাম। না, তবুও মিসকল দিতেই থাকে। তারপর মোবাইলে টাকা উঠিয়ে কলব্যাক করলাম। কল রিসিভ করতে না করতেই বলে কি, এ মাগি।

আমিও বললাম, বাস্টার্ড।

ছেলেদের যে এতো মুখ খারাপ হয় তা আমার জানা ছিল না। Apu, You Are So লম্পট। রাবি–তে চান্স পেলাম না।

অপু তার বন্ধুদের বললো আমার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করতে। একদিন রাত নয়টায় ফোন এলো। রিসিভ করলাম। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। নাম সঞ্জয়। এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

আমি নিশ্চিত, এই অপুর টিম। তারপর কথা বললাম। তবে বেশি নয়। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা কাছে চলে এলো। খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পরীক্ষা শেষ, তারপর সন্ধ্যায় একদিন আমরা সবাই মিলে বসে আছি। হঠাৎ একটা মেসেজ এলো। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

আমিও মেসেজ পাঠালাম, Who are You?

উত্তর এলো, তার নাম মাশফিক, বুয়েটে পড়ে।

মনে মনে হাসলাম আর বললাম, অপু, তুমি কবে করতে চাইবে, আমি সেদিন করবো।

আমি মাশফিককে আর মেসেজ পাঠাতে নিষেধ করলাম এবং বললাম প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। বগুড়া আযিযুল হক কলেজে সায়েন্সের একটা ভালো সাবজেক্ট নিয়ে ভর্তি হলাম। এরপর প্রায়ই অন্য নাম্বার থেকে অপু ফোন করতে লাগলো। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলো। আমি পাত্তা দিলাম না।

সে অনেক মেসেজ পাঠাতে লাগলো। ধীরে ধীরে কেন জানি তার মেসেজগুলো আমার ভালো লাগতে শুরু করলো। তার সঙ্গে কথা বলতেও কি যেন একটা অনুভব করলাম। তারপর একদিন বাইরে থেকে ফোন করলাম। সে তো মহাখুশি। আমি জানতাম, সে আসলে ভণ্ডামি করার জন্য আমার জীবনে এসেছে। তারপরও কেন জানি তার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করলাম।

একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। একা বসে আছি আর বৃষ্টি দেখছি। হঠাৎ তার একটা মেসেজ এলো- *It u want know how to much i miss u try to catch the raindrops. The drops u caught is how much u miss me and the drops u missed is how much i miss u.*

তারপর আরো একটা মেসেজ পাঠালো, *Make a heart which never breaks. Make a smile which never hurts. Make a touch which never pains and make a friendship which never ends.*

যেন হৃদয় স্পর্শ করে গেল এবং মনে মনে অনুভব করলাম, I Love him. সে আমাকে ভালোবাসার অফার করলো। আমিও গ্রহণ করলাম। তারপর তার মিষ্টি কথার ফুলঝুরিতে প্রেম সাগরে ডুব দিলাম।

আমার ছবি চাইলে দিতে চাইনি প্রথমে। তারপর দিলাম।

বাবা মোটামুটি একটা ভালো চাকরি করতেন। সে সুবাদে আমরা বেশ সচ্ছল।

আমি যেমন সুন্দরী তেমনি স্মার্ট। আবার মেধাবী যে কম তাও নয়। সব মিলিয়েই যে কেউ নিঃসন্দেহে পাত্রী হিসেবে ১০০ নাম্বার দেবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের দুজনের ছবি আদান-প্রদান, পরিচয় পর্ব চললো।

অপু দেখতে খুব একটা ভালো নয়। আমি যতোখানি স্মার্ট সে তার কিছুই না। তারপরও তাকে আমি খুবই ভালোবেসে ফেললাম।

বছরের শুরুতেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রায় এক বছর হতে চললো। তাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে লাগলাম, সে সত্যিই আমাকে খুব ভালোবাসে।

তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর আমার বাড়ি বগুড়া। তাই একটু ভয় বাবা-মা যদি রাজি না হন!

তখন সে বলে কি, সমস্যা নেই আমি তো ঢাকাতেই থাকবো।

দেখতে দেখতে রোজা চলে এলো।

আমি একটা মোবাইল কিনলাম, তার জন্যই। শুরু হলো আমাদের আরো গভীরে কথা বলা।

সে প্রায় প্রতিদিনই ফোন করতো। এক মিনিটের জন্য হলেও ফোন করতো। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমি বোধ হয় তার চেয়ে কম ভালোবাসি।

সেহরি খেয়ে প্রায় রাতেই তার সঙ্গে কথা হতো। রোজা খুব একটা রাখতো না। নামাজও পড়তো না। আমি তাকে পড়তে বলতাম।

একদিন কি কথায় যেন তাকে বললাম, আমাদের ছেলের নাম ঠিক করে রেখেছি। সে তখন শুনতে চাইলো। বললাম *অনুভব*।

সে তখন বললো, নামটা তো ভালোই কিন্তু মেয়ে যদি হয়! সেদিন আমি কোনো কথা বলতে পারিনি।

অপু, মনে আছে, তুমি যেদিন তোমার প্রিয় রঙের কথা নীল বলেছিলে সেদিন খুবই অবাক হয়েছিলাম। এ জন্য যে, আমার মেয়ের নাম *নীল* রাখবো। যখন শুনলাম তোমার প্রিয় রঙ নীল তখন খুবই খুশি হয়েছিলাম। তোমাকে খুবই ফিল করি।

কথায় আছে, কেউ যদি মন থেকে আল্লাহতাআলার কাছে কিছু চায়, তবে তিনি নাকি তার মনের আশা পূর্ণ করে দেন। আমিও তাই মন থেকে বলছি, তোমায় ভালোবাসি এবং তোমাকে চাই। তোমাকে পাবো কি? হে আল্লাহ, তুমি কি মনের আশা পূরণ করবে!

দেখতে দেখতে ঈদ এলো এবং চলেও গেল। আমাদের প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো।

নববর্ষ এলো। সেদিন ফোনও করলো না, শুভেচ্ছাও জানালো না। আমি তো অবাক, ফোন করলাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে কথা বললো না।

পরের দিন সকালে ফোন করলাম। সে বলে তার বিয়ে, আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো!

কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে এলো। সে বললো, বাড়িতে গিয়েছে, সবাই জোর করে এনগেজমেন্ট করে দিয়েছে! আমায় বলে কথাটা বিশ্বাস করতে!

আমি বললাম, তাহলে তার নাম্বার দাও?

সে বলে, দেবো না।

তার মানে, অপু ওই মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেই বিয়ে করছে। জানি না, আরো কতো মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট করে দিয়েছো, মন নিয়ে জুয়া খেলেছো।

আমার প্ল্যান ছিল। এবার ১৪ ফেব্রুয়ারি সিনেমা দেখবো, পুরো শহর সারা দিন ঘুরে বেড়াবো, প্রাণভরে তোমাকে দেখবো। আমার খুবই শখ ছিল। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে, কেন এবং কেন? আমি কি অন্যায় করেছিলাম? জানি এর কোনো উত্তর তোমার জানা নেই।

আমার উত্তরটা জেনে নাও। আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম, ভালোবাসি এবং ভালোবেসেই যাবো। *I will love u till the end of time.* আমার জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে ভালোবাসবো এবং তোমার জন্য অপেক্ষা করেই যাবো। কেননা তুমি আসো যদি! তখন যেন ফেরত যেতে না হয় তাই আমি সারাটা জীবনই অপেক্ষা করবো তোমার জন্য। তুমি সুখে থাকো এই শুভ কামনাই করি।

এভাবেই বছরের শুরুতে আমার প্রেম কাহিনী শুরু হলো এবং নতুন বছরের শুরুতেই শেষ হলো। প্রিয় পাঠক আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা কখনো আমার মতো অচেনা, অজানা কাউকে মন দেবেন না। মন দেয়ার আগে একটু খোজ নেবেন, একটু জেনে নেবেন, তাহলে আমার মতো অনুশোচনা করতে হবে না, কাদতেও হবে না।

বগুড়া থেকে

অনিন্দ্য

আমার লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে অনিন্দ্য সেই লক্ষ্য যোজন দূর প্রবাস থেকে মেইল করেছিল প্রশংসা করে। অনিন্দ্যকে আগে চিনতাম না, কোনোদিন তাকে চোখেও দেখিনি, কেউ কোনোদিন পরিচয় করিয়েও দেয়নি।

বয়সে সে আমার চেয়ে প্রায় ত্রিশ বছরের ছোট, বলতে গেলে প্রায় অর্ধেক। বয়সের এ অসমতা আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে কখনো বাধা হয়ে দাড়াতে পারেনি। আমরা নিঃসংকোচে যে কোনো বিষয় নিয়ে

আন্তরিক আলোচনা করতাম, ভাব বিনিময় করতাম, একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও আলোচনা করতে কখনো বাধেনি। মেইল ছাড়াও প্রায় প্রতিদিনই টেলিফোনে যথেষ্ট সময় নিয়ে আলাপ করতো, এখনো করে।

অবাক বিস্ময়ে এক সময় দুজনই অনুভব করলাম, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসা। আবিষ্কারটা এতোই অভাবনীয় যে চমকে উঠেছিলাম প্রথমে। পুরুষ হওয়ায় আমি না হয় একটি মেয়েকে অসম বয়সেও ভালোবাসার কথা বলতে পারি। কিন্তু তার মতো সুন্দরী, শিক্ষিতা, রুচিশীল, আত্মনির্ভর কোনো আধুনিক-সচেতন তরুণীর পক্ষে আমার মতো ষাটোর্ধ বৃদ্ধের ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়াটা রীতিমতো বিস্ময়কর ও অচিন্ত্যনীয়। আমার বয়স, শারীরিক দুর্বলতা, অসুন্দর চেহারা, বয়সের ছাপ ধরা ভঙ্গুর দেহ, মানসিকতা, রুচি-অরুচি, পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান সবই সে বিস্তারিত জানে যেমন আমিও তার জীবনের সব কিছুই জানি। আমরা পরস্পরের কাছে একেবারেই স্বচ্ছ ও অকপট। আমাদের ভুলত্রুটি লুকিয়ে রাখি না, আলোচনা করে সেগুলো দূর করার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সাহায্য করি। এতো মন্দ দিক থাকা সত্ত্বেও অনিন্দ্য আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তার অনুপম ভালোবাসা অনুভব করি আমার হৃদয়ে, এমন নিখাদ ভালোবাসা যা পৃথিবীতে সত্যিই অতুলনীয়।

ভালোবাসার বয়স নির্দিষ্ট হয়নি আজো। এ কথা আমি যেমন বিশ্বাস করি, অনিন্দ্যও সেটা বিশ্বাস করে হৃদয় দিয়ে। তাই আমরা কোনোদিনই বয়স হিসাব করে ভালোবাসার ঘরে দান ফেলার চিন্তা করি না। জীবন নিয়ে আমরা জুয়া খেলায় মেতে উঠি না। শীর্ণ ডালে কোনোদিন ফুল ফোটে না, এ কথা যারা বলেন তাদের বলতে চাই, ভালোবাসার কথা তারা শুনেছেন সত্য কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসার পরিচয় তারা কোনোদিনই পাননি। আমরা পেরেছি, সেখানেই আমাদের জয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

মিরপুর, ঢাকা থেকে

জীবন যখন যেমন

বাবার অভাবের সংসার। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এসএসসি-তে একটা কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট করেছি। আমাদের পুরো বংশে আমিই প্রথম এসএসসি পাস করায় আত্মীয়স্বজনসহ পরিবারের সবাই খুশি। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার মতো সাধ্য নেই।

বাবা স্বল্প আয়ের শ্রমিক, বড় পরিবার। আমি ছাড়াও ছোট এক ভাই ও দুই বোন পড়াশোনা করে। এ অবস্থায় কলেজে ভর্তি হওয়ার আশা নিরাশা মাত্র। ঠিক এ অবস্থায় যেন দেবদূত হয়ে হাজির হলেন প্রতিবেশী এক মামা। তিনি আমার জন্য শহরতলিতে লজিংয়ে ব্যবস্থা করে দিলেন। লজিং মালিক সরকারি চাকরিজীবী। বিয়ে অবশ্য দুইটি। দুই স্ত্রী আছেন। দুই স্ত্রীর ঘরেই ছেলেমেয়ে আছে। স্ত্রীরা আলাদা বাড়িতে থাকেন। লজিং মালিকের দ্বিতীয় স্ত্রীও সরকারি চাকরি করেন। আমার দায়িত্ব হলো দ্বিতীয় স্ত্রীর ক্লাস সেভেন ও ক্লাস থ্-র দুই ছেলেকে পড়ানো। মামার কথা অনুযায়ী দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার কর্মস্থলে দেখা করতে যাই। তিনি নিজ বিভাগীয় শহরে কর্মরত। মালিক অবশ্য অন্য বিভাগে।

তার সঙ্গে দেখা করে মোটামুটি ভালোই লাগলো। যথেষ্ট বিনয়ী, ব্যক্তিত্ববান এবং মার্জিত স্বভাবের। চাকরিটাও অবশ্য সম্মানজনক পদে। দেখতে কিছুটা আমার এক খালার মতো। তাই তাকেও ডাকি খালা বলে। খালার সঙ্গে কথাবার্তায় মিল হওয়ায় আমার তল্পিতল্পাসহ নির্দিষ্ট দিনে লজিংয়ে গিয়ে উঠি।

এখন কলেজে ভর্তি হওয়ার পালা। আমার হাতে মায়ের সংসার খরচ থেকে বাচানো কিছু টাকা আছে। কলেজে ভর্তি হতে আরো টাকার দরকার। তাই টাকার জন্য আমার এক চাচার কাছে চিঠি লিখি। তিনি ঢাকায় আদম ব্যবসা করেন।

খালা সকালে যখন তার কর্মস্থলে যাচ্ছেন তখন তার কাছে চিঠিটি দিই পোস্ট করার জন্য। সন্ধ্যায় ছাত্রদের পড়াচ্ছি, তিনি অফিস থেকে ফিরেই আমাকে ডাক দিলেন কথা শোনার জন্য। তিনি জানতে চাইলেন আমার কতো টাকার দরকার কলেজে ভর্তি হতে।

এ কথা শুনে চমকে গেলাম। তাকে কিছু বলছি না, ভাবছি তিনি কি তাহলে আমার চিঠি পড়েছেন?

তিনি নিজ থেকেই বললেন, তোমার চিঠি পড়েছি এবং ওটা আমার কাছেই।

চিঠিটি চাইলাম পোস্ট করার জন্য।

তিনি আমাকে চিঠি না দিয়ে বরং আমার হাতে দুই হাজার টাকা দেন কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য।

টাকা নিতে না চাইলে তিনি বলেন, তুমি আমাকে খালা ডেকেছো, খালা হিসেবে আমার দায়িত্বটাও পালন করতে দাও। কোনো আপত্তি করো না। তুমি আমার ছেলের মতো। আরো বললেন, তোমার যখন এতোই আপত্তি তাহলে এখন কলেজে ভর্তি হও, সুযোগ মতো আমাকে ফেরত দিও। তার এ আন্তরিকতা দেখে আমি কেদেছি।

আমার অনেক আত্মীয়স্বজন আছেন যারা বিত্তবান, অথচ তাদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি।

এরপর কলেজে ভর্তি হলাম। তিনি বইও কিনে দিলেন। ক্লাস করছি। কলেজে যাওয়ার জন্য বাইসাইকেলও কিনে দিলেন। তাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন সবার কাছে একজন প্রিয় পাত্র হলাম ভদ্র ও ভালো ছাত্র হিসেবে। কলেজ আর খালার অফিস কাছাকাছি হওয়ায় মাঝে মাঝে তার অফিসে যেতাম। তিনি অনেকের কাছে আমার পরিচয় দিতেন ছেলে বলে। আমিও তার ছেলে হয়ে আনন্দ পেতাম। এতো আন্তরিকতা দেখে শ্রদ্ধায় তার প্রতি আমার মাথা নত হয়ে যেতো। আমার জামাকাপড় থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব কিছু নিজে কিনে দিতেন।

এখন অন্তত আমার পড়াশোনার জন্য পেছনে ফিরে তাকাতে হয় না। আমার দুঃখী মা বাবা, ভাইবোন সবাই খুশি আমার ভাগ্যে এমন একজন খালা মিলেছে বলে। নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করছি। প্রতি মাসে একবার বাড়িতে যেতাম মা, বাবা, ভাইবোনকে দেখার জন্য। আমার আনন্দ আর দেখে কে। রঙিন স্বপ্ন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

এর মাঝে শুরু হলো ক্লাস টেস্ট। কমার্সের ছাত্র হওয়ায় পড়াশোনার চাপও একটু বেশি। ছাত্রদের পড়িয়ে নিজের পড়া কভার করতে না পারায় মাঝে মাঝে রাত জেগে পড়তে হয়। এভাবে এক রাতে পড়া শেষ করে রাত দুইটার দিকে ঘুমাতে যাই।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ শব্দ পেলাম। বুঝলাম আমার খাটের ওপর কেউ বসেছে। আমি ভয়ে দিশাহারা। বিশাল এক ঘরের ভেতর পাচজন মানুষ। তার ভেতর পুরুষ বলতে আমিই। গৃহকর্তা অর্থাৎ খালু অন্য বিভাগে কর্মরত। দুই ছেলেসহ খালা থাকেন ঘরের ভেতর। কাজের বুয়া থাকে পেছনের বারান্দায় আর সামনের বারান্দায় আমি একা। এসব ভেবে ভয়ে অস্থির। চোর চোর বলে চিৎকার করতে গেলে আমার মুখ চেপে ধরে একটি মেয়েলি কণ্ঠ আমাকে বলছেন, ভয় পেয়ো না, চোর নয়, আমি।

আমি মানে আমার সেই খালা। যে সবার কাছে আমাকে পরিচয় করে দেন ছেলে বলে, যার আন্তরিকতা, স্নেহ, মমতায় আমার মাথা নত হয়ে যায়। এ-ও কি ভাবা যায়!

কেন এসেছেন জানতে চাইলে বলেন, আমার ঘুম আসছে না। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। তোমার কাছে একটু শোবো তোমাকে জড়িয়ে, আর কিছু নয়। ভয় পেয়ো না।

তাকে চলে যেতে বললে তিনি অনুরোধ করে বলেন, প্লিজ, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না। তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে থাকো।

আমার মুখ থেকে আর কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। ঠিকই লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে রইলাম।

তিনিও আমাকে পরম মমতায়, নাকি যৌনতায় জড়িয়ে শুয়ে আছেন! এভাবে থাকার পর ফজরের আজানের সময় উঠে গেলেন।

তিনি অবশ্য আমাকে দেয়া ওয়াদা যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরা ছাড়া কিছুই করেননি।

আমিও কাঠের পুতুলের মতো শুয়েছিলাম। লজ্জায় ওইদিন আর তার সামনে যাইনি। তাকে দেখলেই এড়িয়ে যেতাম।

এর ঠিক দুই দিন পর। সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল। ছাত্রদের পড়িয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাই। মনমানসিকতা খুবই খারাপ। ঘুম আসছে না। নানাধরনের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ভাবছি এখান থেকে চলে যাবো কি না আর যাবোই বা কোথায়। কতো আশা নিয়ে এখানে এসেছি, কলেজে ভর্তি হয়েছি, এখানের অবস্থা এই!

তখন হয়তো রাত এগারোটার মতো হবে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় খালা আবার হাজির।

তাকে দেখেই তার পায়ে হাত দিয়ে অনুরোধ করি চলে যাওয়ার জন্য। তাকে অনেকভাবে ভয় দেখিয়ে বললাম, লোকলজ্জা, সম্পর্ক, বয়স এবং আমার অবস্থান, অন্তত এসব ভেবে আপনি আমাকে বাচান। বাচতে সাহায্য করুন।

কে শোনে কার কথা। তিনি নাছোড়বান্দা। তার একই কথা, তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। সেদিনের মতো তোমাকে জড়িয়ে শুধু ঘুমাবো আর তুমি যদি ভালোই হও তাহলে তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

তাকে অনেক বুঝিয়েও যখন ব্যর্থ তখন শুয়ে পড়ি।

তিনিও আমার পাশে শুয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আমাকে চুমু দেন লক্ষ্মী সোনা বলে। চুমু মুখ থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে, এমনকি আমার বিশেষ অঙ্গটাও বাদ পড়েনি।

তখনই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমিও সম্পর্ক, বয়স, ধর্ম, লোকলজ্জা, দারিদ্র সব কিছু ভুলে তার মতো শুরু করি। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। কতোক্ষণ আর ঠিক থাকা যায়, আমিও তো রক্ত-মাংসে গড়া এক টগবগে যুবক।

শেষে তাকে বস্ত্রহীন করলাম। তার বুকের ওপর উঠলাম। অদক্ষ মাঝি হয়েও দক্ষ মাঝির মতো নৌকার হাল ধরলাম। নৌকা যখন কিনারে ভিড়ছে তখন আমি ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, অবসন্ন দেহ নিয়ে পড়ে আছি।

তিনি পাগলের মতো আমাকে চুমু খাচ্ছেন আর রাজা রাজা বলে ডাকছেন।

এভাবে সমস্ত রাত দুটি দেহ বস্ত্রহীন একাকার হয়ে শুয়ে ছিলাম। এটাই ছিল আমার প্রথম নৌকা ভ্রমণ। খুব মজা পেয়েছিলাম। ফজরের আজানের ধ্বনিতে তিনি আমাকে ছেড়ে তার ছেলেদের কাছে চলে গেলেন।

যাওয়ার সময় আলতো করে একটি চুমু দিয়ে কানে কানে বলেছিলেন, সত্যিই তুমি আমার রাজা।

সকালে অফিসে যাওয়ার সময় টেবিলের ওপর রাখা আমার কলেজ ডায়রিতে লিখেছিলেন,

আমার রাজা

অন্তর থেকে তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা। তুমি মন খারাপ করো না। কেউ যদি কিছু দিতে চায় ফিরিয়ে দিতে নেই, বরং সাদরে নিতে হয়। আমি সব সময় তোমার মঙ্গল কামনা করি। তুমি ভালো থেকো। আজ আমি খুবই সুখী একজন নারী। এদিনটিকে কোনো দিনও ভুলবো না।

ইতি...

পুনশ্চ : আজ একটার সময় অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, একত্রে লাঞ্চ করবো।

ঠিক একটার সময় অফিসে গেলাম। একত্রে লাঞ্চ করলাম শহরের অভিজাত এক রেস্টুরেন্টে। অফিস শেষে একটি সিনেমাও দেখেছি।

এরপর আমাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আমাদের অভিযান চলতো অঘোষিত স্বামী-স্ত্রীর মতো। সবার চোখ ফাকি দিয়ে অভিযান চলতো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। ছেলেদের বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে রিকশায় করে ঘোরা, সিনেমা দেখা, পার্কে যাওয়া সবই চলতো রুটিন করে। আমাদের এই অবাধ চলাফেরায় বাইরের লোকদের সন্দেহের অবকাশই নেই, কারণ তিনি আমার খালা। সবার

সামনে তাকে পীরের মতো শ্রদ্ধা করি। তাছাড়া তারা ছিল এলাকার প্রভাবশালী। আমার এবং তার অবস্থা এমন হলো, এক মুহূর্ত না দেখলে ভালো লাগে না।

তাকে প্রস্তাব করেছিলাম পালিয়ে বিয়ে করার জন্য।

তিনি রাজি হননি। তার সরকারি চাকরি, ছেলে, বয়স। তিনিই বলেছেন, বিয়ের কি দরকার। বিয়ে ছাড়াও তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। যখন চাইবে তখনই পাবে। ইচ্ছা করলে আজীবন আমার এখানে থাকতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই।

ঠিকই কোনো অসুবিধা হতো না। যখন চাইতাম তখনই পেতাম। এমন কি গৃহকর্তা বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও তাকে পেয়েছি। কর্তা প্রতি মাসে একবার বাড়িতে আসতেন দুই দিনের জন্য। এ দুই দিনও তাকে ছাড়া থাকতে পারতাম না। অন্তত দশ মিনিটের জন্য হলেও কাছে চাই।

তার পেটে একবার আমার বাচ্চাও এসেছিল। এতে কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারেনি কারণ। কর্তা সাহেব প্রতি মাসেই বাড়িতে আসতেন। তবে বাচ্চাটি যে আমার ছিল সেটা তিনি নিশ্চিত হয়েই বলেছেন। পরে শহরের এক ক্লিনিকে অ্যাবরশন করানো হয়। দিনগুলো মনে হয় চলতে লাগলো কয়েক হাজার মাইল গতিতে। আমিই বলতে পারিনি এতোদিন কিভাবে চলে গেল।

এসে গেল এইচএসসি পরীক্ষা। পড়ালেখার অবস্থা খুবই খারাপ। পড়ালেখা হবেই বা কেমন করে। দিন হলে চিন্তায় থাকতাম কখন তাকে নিয়ে একটু রিকশায় করে ঘুরবো। রাত হলে চিন্তায় থাকতাম কখন ছেলেরা ঘুমাবে আর আমরা একত্র হবো। পড়ালেখায় এমন ভাটা যা বলা বাহুল্য। তবুও অপ্রস্তুত অবস্থায় পরীক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এসএসসিতে এতো ভালো রেজাল্ট এখন যদি পরীক্ষা না দিই বন্ধুরা, বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই অন্য কিছু ভাববে। তাই বাধ্য হই পরীক্ষা দিতে।

পরীক্ষা দিলাম। ইতিমধ্যে বাবাও ডাক্তারি পরীক্ষায় চাকরিতে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছেন। আমার পরীক্ষার অবস্থাও খারাপ, সংসারের অবস্থাও খারাপ। নিজেকে লুকানোর জন্য সবার সঙ্গে নাটক করার সুন্দর একটি পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

বাবাকে বললাম, আর পড়াশোনা করবো না। বিদেশ যাবো। যুক্তি হিসেবে দাড় করালাম ছোট ভাই ও বোন দুটির ভবিষ্যতের কথা।

বাবা এটাই চাইতেন যেন আমি আয়ের একটা পথ ধরি। বাবা রাজি হলেন।

প্রস্তাব করলাম, তার এককালীন পাওয়া টাকা থেকে কিছু টাকায় আমি বিদেশে যাবো বলে।

বাবা তাতেও রাজি হলেন।

অবশেষে আদম ব্যবসায়ী চাচার মাধ্যমে মালয়শিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। অল্প দিনের ভেতর মালয়শিয়া যাওয়ার কাগজপত্র তৈরি হলো। তখনই ঘটলো চরম বিপত্তি।

আমার সেই খালা যাকে নিয়ে রাতের পর রাত এক বিছানায় শুয়েছি, ভোগ করেছি তিনি আমাকে প্রস্তাব করলেন তার সতীনের অর্থাৎ কর্তার প্রথম স্ত্রীর ক্লাস এইটে পড়ুয়া মেয়েকে বিয়ে করার জন্য।

আমার আত্মহত্যা করার মতো অবস্থা। এটা কি করে সম্ভব! যার স্ত্রীর সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক তার মেয়ের সঙ্গে আবার শারীরিক সম্পর্ক কি করে সম্ভব!

তাছাড়া আমার পারিবারিক অবস্থা, আত্মীয়স্বজনের মতামত সব কিছু তাকে বুঝিয়ে বললাম। তিনি কোনোভাবেই মানছেন না। বরং এমন কিছু কঠিন পদক্ষেপের কথা বলছেন যাতে আমি কেন, যেকোনো লোকেরই ভয় পাবার কথা। এমনকি আমি যদি এ বিয়ে না করি তাহলে নাকি তাকে তার স্বামী তালাক দেবেন। এক পর্যায়ে তিনি হুমকি দেন বিয়ে না করলে আমার মালয়শিয়া যাওয়ার পথ বন্ধ করবেন।

শেষে কোনো উপায় না দেখে দুঃখী মা, বাবা, ছোট ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ফাকি দিয়ে চোরের মতো শহরের এক কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি করি। তাও মালয়শিয়া যাওয়ার ঠিক চার দিন আগে। জানি না এ পাপ ক্ষমার যোগ্য কি না।

ধর্মীয় মতে এর সমাধান খোজার অনেক চেষ্টা করেছি গোপনে। কিন্তু আজো সঠিক সমাধান পাইনি। এক ধরনের পাপ, অন্যায়, অপরাধ বোধ সব সময় আমাকে তাড়া করে। কোথাও স্বস্তি পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয় কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু পারছি না। যাকে বিয়ে করা ধর্মীয় আইনে বিধিসম্মত নয় এবং পাপ তারই গর্ভে আমার আদরের মানিক যখন আব্বু বলে ডাক দেয় তখন সব কিছু ভুলে যাই।

যার দয়া, স্নেহ, মমতা এবং ভালোবাসায় আজ আমার এ অবস্থা তিনিও আর এ পৃথিবীতে নেই। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পাচ বছর আগে গত হয়েছেন। রেখে গেছেন অনেক স্মৃতি আর দিয়ে গেছেন পাপের বোঝা যা আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সউদি আরব থেকে

চুমুর সাতকাহন

আদিত্য আরাফাত

আবেগ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো চুমু। চুমুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ইমোশনের অনেক স্তর, বাধভাঙা যৌবনের নানা মাত্রা, যৌনতার বহুতর তরঙ্গ! কখনো তা স্নেহের বহিঃপ্রকাশ। মায়ের একটি চুমুতে মমতার অমৃতধারা ঝরে পড়ে সন্তানের দেহমনে, প্রিয়তমের একটি আবেগময় উত্তপ্ত চুম্বনে অজস্র গোলাপ ফুটে ওঠে প্রিয়তমার নরম গালে। চুম্বনই ভালোবাসার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। চুমু! এ ছোট্ট শব্দটিকে নিয়ে ক্রমাগত গবেষণায় আছে বিজ্ঞান। গবেষণায় জানা গেছে, চুমু সুস্থতার নিদর্শন। চুমুই পারে দেহমন সতেজ রাখতে, জীবনের অবিরাম জয়গান করতে...।

হরেক রকম চুম্বন : স্থান কালভেদে একেক দেশে একেক রকমের চুম্বনের প্রচলন রয়েছে। টেক্সাস ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রোপলজি বিভাগের প্রধান প্রফেসর ভন ব্রায়ান্ট জুনিয়রের সাম্প্রতিক চুম্বন বিষয়ক এক গবেষণায় জানা গেছে, চুম্বনের উত্তরণের আগে মানুষ তার প্রিয়জনকে সোহাগ জানাতো নাকে ঘষে। রোমানরা চুমু খাওয়ার নানা নিয়ম কানুন চালু করেছিল। এক এক শ্রেণীর জন্য এক এক ধরনের চুম্বন। বয়স্ক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানাতে এক ধরনের চুম্বন, শিশুদের বা সন্তানের প্রতি এক ধরনের চুম্বন, প্রিয়তমকে ভালোবাসা জানাতে এক ধরনের চুম্বন এবং যে কারো সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ার আগে ঠোটে ঠোটে গভীর গাঢ় চুম্বন। চুম্বনের নানারকম। রীতিনীতি, কলাকৌশল রোমানরাই আমাদের শিখিয়েছে। রোমানদের চুম্বনরীতি অনেক দেশেই প্রচলিত রয়েছে। আরব দেশে অবশ্য রোমানদের চুম্বনরীতির ভিন্নতা দেখা যায়। আরবরা কাউকে ভালোবাসা জানান সাধারণত হাতের কবজিতে চুমু খেয়ে কিংবা মুখের একপাশের সঙ্গে আরেক পাশ লাগিয়ে। তবে শারীরিক সম্পর্ক গড়ার আগে আরবরা রোমান চুম্বন তথা ঠোটে ঠোটে গভীর গাঢ় চুম্বন করেন তারপর শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য, শারীরিক সম্পর্ক গড়ার আগে রোমানদের গাঢ় চুম্বনরীতি সব দেশেই বিদ্যমান বলে গবেষকরা জানিয়েছেন।

চুমু খাও, চুমু দাও : সকাল বেলা পরিপাটি হয়ে আপনি চাকরিতে বা ব্যবসা স্থানে যাচ্ছেন? তবে যাওয়ার আগে আপনি আপনার স্ত্রী, সন্তানদের চুমু খেয়ে যান এবং চুমু দিয়ে যান। গবেষকরা জানিয়েছেন, কোথাও যাওয়ার আগে প্রিয়জনের চুমু খেয়ে যাওয়া ও দিয়ে যাওয়া তার মন মেজাজ অত্যন্ত সতেজ রাখে এবং পজিটিভ অ্যাটিটিউড বাড়াতে সাহায্য করে, জন্ম নেয় আত্মবিশ্বাস ফলে সাফল্যের চূড়ান্তে পৌছাতে সক্ষম হয়। অতএব, মহা আনন্দে চুমু খান।

ব্যায়ামের বিকল্প চুমু : আমাদের দেহে প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নির্দিষ্ট ব্যায়াম রয়েছে। এসব ব্যায়াম অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সতেজ রাখে। গবেষকরা জানিয়েছেন, প্রিয়তমার সঙ্গে গভীর গাঢ় চুম্বন মুখের চৌত্রিশটি মাসলসই নাড়াচাড়া করে ফলে মুখের ভালো এক্সারসাইজ হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বার্ধক্য

রুখতে মুখের এক্সারসাইজ জরুরি আর মুখের ভালো এক্সারসাইজ হলো গভীর চুম্বন। অতএব, বার্ধক্য রুখতে মুখের টানটান ভাব বজায় রাখতে প্রিয়তমের সঙ্গে গাঢ় চুম্বনে মিলিত হন।

এক মিনিটের চুম্বনে ২৬ ক্যালরি : ফিলেম্যাটোলজিস্টরা সায়েন্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় জানিয়েছেন, এক মিনিটের গাঢ় চুম্বনে ২৬ ক্যালরি শক্তি খরচ হয় আর তাই যারা শরীর থেকে অতিরিক্ত ক্যালরি ঝরিয়ে শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখতে চান তারা গোটা কয়েক চুমু খেয়ে নিন, এতে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকবে।

না জানলে জেনে নিন

- অধিকাংশ দেশেই রোমানদের চুম্বনরীতি বলবৎ রয়েছে।
- মানব জীবন গড়ে দুই সপ্তাহ কাটায় চুমু খেয়ে।
- পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম চুম্বনের রেকর্ড হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ২৪ মার্চ নিউ ইয়র্কে। ব্রেথ সেভার্স লংগেস্ট কিস চ্যালেঞ্জ-এর প্রতিযোগীরা ঊনত্রিশ ঘণ্টা চুমুরত থেকে সারাবিশ্বকে অবাক করে দেন।
- চলচ্চিত্রের প্রথম চুম্বন ১৮৯৬ সালের মে, আরউনকে জন সি রাইসের চুম্বন দি কিস মুভিতে।
- প্রকাশ্যে চুমু খাওয়ার শাস্তি হিসেবে ইরানের এক চলচ্চিত্র অভিনেত্রীকে ৭৪ ঘা চাবুক মারার নির্দেশ দিয়েছিল কট্টরপন্থীরা। মধ্য ইরানের ইয়াজদ শহরের আদালত এ রায় দেয়।
- বাংলাদেশের সাবেক মহিলা প্রধানমন্ত্রীর হাতে অন্য দেশের এক পুরুষ প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এসে চুমু খেলে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন।

চুম্বনে হতে হবে আকর্ষণীয় ঠোঁট। আকর্ষণীয় ঠোঁট প্রকৃতির দান। দেখা যায় অনেক সুন্দরী মেয়েরই আকর্ষণীয় ঠোঁট নেই। এমনও দেখা গেছে, যে মেয়ে সুন্দরী নয়, কোনো আকর্ষণ শক্তিও নেই অথচ চুম্বনের ক্ষেত্রে তারই ঠোঁট চমৎকার।

মাংসল সরস দুটি ঠোঁট যখন চোখ বন্ধ করে গভীর আবেগে কোনো প্রিয়তম তার প্রিয়তমার ঠোঁট চেপে ধরে তখন সে চলে যায় এক স্বর্গীয় উদ্যানে...।

তো হয়ে যাক! পৃথিবীর বহু পুরনো কিন্তু চির অমলিন বিষয় চুমু। অজানা অজ্ঞাত কাল থেকেই নারী পুরুষ তার ইমোশন প্রকাশ করে আসছে চুমুর মধ্য দিয়ে। চুমুর মাধ্যমে প্রকাশ পায় প্রেমের অভিব্যক্তি, ভালোবাসার বাধভাঙা জোয়ার। চুমু জীবনের জয়গান গায়, চুমু শারীরিক মানসিক সুস্থতার নিদর্শন, যৌবনের বাধভাঙা জোয়ার। তাই ভালোবাসা জানাতে বেশি বেশি চুমু খান...।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: চুমুর অনেক ইতিবাচক কথা শুনে যাকে তাকে চুমু দেবেন না। যাকে তাকে চুমু দিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার দোষ এ লেখকের ওপর বর্তাবে না।

ঠিকানা বিহীন

নীল দংশন

ইমদাদ

আমি কেমন আছি তা তুমি আর কোনো দিন জানতে চাইবে না। তুমি তো এখন মহা সুখে আছো শাহজাহানের তাজ মহলে। পৃথিবীর সবাই চায় সুখ নামের সোনার হরিণটাকে ধরতে। সেই সোনার হরিণ যদি নাগালের মধ্যে থাকে তাহলে আর কোনো কথাই নেই।

সত্যিই কি চমৎকার এক ভাগ্য নিয়ে এই মায়াভরা পৃথিবীতে এসেছো তুমি। মায়াময় কিছু হাসি, কিছু গল্প, ছোট কিছু ঘটনার স্মৃতি রেখে গিয়েছো তুমি। সেই ফেলে আসা দিনের আবেগ জড়ানো স্মৃতি আজ ভাবতে গেলে ভালোই লাগে। স্মৃতিগুলো আমাকে ভাবায় সারাক্ষণ। আমাকে নিয়ে খেলা করে সেসব স্মৃতি।

তোমার কি মনে আছে আমাদের ভালোবাসার প্রথম দিনের সেই তারিখটা? আজো আমি মনে রেখেছি। সেদিন তোমাকে ভালোবাসতে উৎসাহ দিয়েছিলে তুমিই। বলতে গেলে এক পর্যায়ে জোর করেই আমাকে ভালোবাসালে তুমি।

তার আগে তুমিই একদিন আমাকে বলেছিলে, ভাইয়া, আবেগতাড়িত হয়ে জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন না। যখন ভেবেচিন্তে সত্যিই সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাকে ভালোবাসার, তখন মিষ্টি হেসে ডেকে আরো অনেক কাছে টেনে নিয়েছো। সেদিন দিয়েছো হাজার বছরের না পাওয়া উত্তপ্ত স্পর্শ, আদর, ভালোবাসা ও লাল ঠোটের নীল দংশন।

চুমু খেতে খেতে যখন তোমাকে আরো কাছে টেনে নিয়েছি তখন তুমি মৃদু কণ্ঠে ছোট করে বলেছিলে, আমার খুব ভয় হয়। তারপর? তারপর... না লেখা আরো অনেক কিছুই।

পরে কোনো এক চিঠির লাইনে তোমাকে লিখেছিলাম, *ভালোবাসলেও সবার সঙ্গে ঘর বাধা হয় না।*

উত্তরে তুমি লিখেছিলে, আমি আর তুমি ঘর বাধলে আর কারো কিছু যায় আসে না।

আরো লিখেছিলে, মনা, ভালোবাসা মাপার যদি কোনো যন্ত্র থাকতো তাহলে আজ সত্যিই মেপে দেখিয়ে দিতাম, তোমাকে কতোটুকু ভালোবাসি।

জানি আজ তোমার ওইসব লেখা, কথা ও গল্প কোনো কিছুই মনে নেই। কিন্তু ভুলতে পারছি না আমি। দোলনার মতো দুলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত আমার স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি।

সত্যিই *কে*, তুমি সুন্দর অভিনয় করতে পারো, পারো আরো অনেক সুন্দর খেলা। তোমরা সবই পারো। গ্রামীণফোনের মোবাইলের মতো *আপনার পকেটে যথেষ্ট পরিমাণ ভালোবাসা না থাকায় সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না* বলতে পারো সহজেই।

ভালোবাসাকে পুতুল খেলা মনে করো, মনে করো কাবাডি খেলা। কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার আগেই খেলার আনুষঙ্গিক উপকরণ ও পুরস্কার হাতে না নিয়েই নিজেকে নিজেই বিজয়ী ঘোষণা করো। আরো এক নতুন স্বপ্নের ভুবনে চলে যাও, তাই না?

কে, আজ আমি তোমার মতো মেয়েদের স্পষ্ট করে বলতে চাই, তোমরা নিজেকে এতোটা বিজয়ী কেন মনে করো? কেন?

আজ তোমাদের এই মুখোশ পরা নকল হাসি আর বিজয়ের নিশানটাকে আমি ইচ্ছা করলেই খুলে ফেলতে পারি। কিন্তু না, থাক।

তুমি তো চলেই গেছো, কিন্তু খেলনাগুলো ফেলে গেলে কেন? বোকা মেয়ে, জানো না, তোমার এসব খেলনা দিয়ে আমি কি করতে পারি? তোমার তাজ মহল গুড়ো করে দিতে পারি। তুমি এক সঙ্গে দুই, টু ইন ওয়ান, নামি শিল্পী আর দামি খেলোয়াড়। এমন খেলোয়াড়ের শিরোপা সমাজের ভয়ে তুমি চাইবে না। আমিও তোমাকে তা দেবো না। কেননা, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। তোমার সারা অঙ্গে আমার স্পর্শ ও ছোয়া লেগে আছে। ভালোবাসার মানুষকে শাস্তি দেয়া যায় না। তুমি দিয়েছো। আমি মেনে নিয়েছি। আমি প্রতিশোধ নেবো না।

কে, তুমি একদিন লাল, নীল, গোলাপি আর সবুজ রঙের কাগজে নিজ হাতে বানানো সুন্দর একটি ফুল দিয়ে মৃদু হেসে বলেছিলে, ফুলটা আজই বানাতে শিখেছি, আর তাই বানিয়ে তোমাকেই দিলাম। আজ প্রশ্ন জাগে –কাগজের ফুল বানানো শেখার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনই কি তুমি প্রতারণাও বানাতে শিখেছিলে? তাই দিয়েছিলে বাহারি কাগজের ফুল? এছাড়া ছবি, শুভেচ্ছা কার্ড সবই আজ মলিন হয়ে আসছে। কৃত্রিমতার কি আর প্রাণ! কয়দিন আর বাচে?

তুমি আমাকে শেষ চিঠিতে লিখেছিলে, মনা, এ মুহূর্তে তোমাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা করছে। এখন কাছে পেলে ইচ্ছা মতো তোমাকে আদর ও চুমু দিয়ে পাগল করে দিতাম। তারপর তোমার বুকে আমার এ পাখির ছানার মতো কচি বুকটা রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম এক সময়।

ময়মনসিংহ শহরের রেস্টুরেন্ট রুম থৃতে রাত সাড়ে আটটায় তুমি আমার সঙ্গেই ছিলে। তুমি আমার ওপর ক্ষেপে গিয়েছিলে। অনেক কৈফিয়ত দিয়ে সন্ধ্যার পরে সেদিন বাসা থেকে বের হতে হয়েছিল তোমাকে। আর কখনো সন্ধ্যার পরে আমি যেন তোমাকে না ডাকি।

আর কোনো দিন তোমাকে দিনের বেলাতেও আমি ডাকবো না। সেদিন তোমাকে আদর দিতে দিতে বলেছিলাম, তুমি আমার লক্ষ্মী পুতুল, রাতে কখনো আর তোমার কাছে আসবো না। আজ তাই সত্যি হলো। রাতে আর তোমার কাছে আসা হলো না আমার। তোমার রাতগুলো এখন অন্য পুরুষের, অন্য প্রেমিকের, অন্য স্বামীর। সেই রাতই ছিল তোমার সঙ্গে আমার শেষ রাত।

এখন তুমি বিয়ে করেছো। বিয়ের আগের দিন ফোনে আমার মা এবং আমাকে বলেছিলে, তোমার বিএড প্রশিক্ষণ শেষ হলেই আমরা বিয়ে করবো। পরের দিন যখন জানলাম তোমার বিয়ের কথা বিশ্বাস করিনি। ছুটে গিয়েছিলাম তোমাদের বাড়িতে। গিয়ে দেখি, সত্যিই তোমার বিয়ে। সারা বাড়ি মাথায় তুলে চিৎকার করে তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এ কি করলে তুমি? খুব সুন্দর করে অল্প কথায় একটি সহজ জবাব দিয়ে আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলে।

সত্যিই হিন্দি ফিল্মের কাহিনী ও নায়িকারাও তোমার কাছে ফেল। তবে কি আমাদের প্রেমও সিনেমা খেলা ছিল? নায়িকা ছিলে তুমি। নায়ক হিসেবে আমি হিট করতে পারিনি। তুমি নায়িকা হিসেবে বেশ হিট হয়েছো। তোমার আসলেই অভিনয়ে নামা উচিত। অভিনয় প্রতিভার গুণে সত্যকেও মিথ্যা বানাতে পারবে। আর মোটা অংকের টাকাও কামাতে পারবে।

কে, তোমার মতো গুণী এক অভিনয় শিল্পীর অভিনীত যেটুকু ভালোবাসা পেয়েছি তাতেই আমি বেশ সন্তুষ্ট। আমার কোনো কষ্ট নেই। কষ্টের নদী পার হতে ছোট একটি তরী বানিয়েছি। আমার মতো অনেকেই তেমন তরী বানায়। আজ না হয় শিল্পী বশির আহমেদের সেই গানটা *আমাকে পোড়াতে যদি এতো লাগে ভালো...* গাইতে গাইতে তরী বাইতে বাইতে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দলের একজন হবো। তারপর সবাই মিলে সেই কষ্ট নামের ছোট নদীর নীল জলে স্নান করবো জীবনভর। তবু তোমার আশা পূর্ণ হোক।

কে, আমার এ লেখাটা যদি কখনো তোমার চোখে পড়ে তাহলে মন খারাপ করো না। কেননা, আমি তো তোমার লক্ষ্মী মনা ছিলাম। কামনা করি, ফুলপুরে ফুলের মতো ফুটে থেকো তুমি। ভালো থেকো জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। সুখে থেকো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষটির মতো। তোমার সুখের দুয়ারে এসে ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে কোনো দিন দাড়াবো না। কোনো দিন না। কখনো না।

পূর্বধলা, নেত্রকোনা থেকে

সংজ্ঞা

আদনান

ভালোবাসা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। সৃষ্টির শুরু থেকেই এর চর্চা। হাজারো গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ কতো কিছু লেখা হলো এই ভালোবাসা নিয়ে। ফলাফল শূন্য। আসলে ভালোবাসা কি? ভালোবাসা যদি হয় শুধু অনুভবের অনুভূতি তাহলে এ নিয়ে গবেষণা চলবে আমৃত্যু। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। ভালোবাসা যদি হয় স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির অনুরাগ, অসীমের প্রতি সসীমের অনুভূতি কিংবা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার বা মা-বাবার প্রতি সন্তানের তাহলে ভালোবাসার কিছু একটা নিষ্পাপ-নিষ্কাম অর্থ দাড়ায়।

কিন্তু নরনারীর ভালোবাসা, আরো সুনির্দিষ্ট করে দুজন তরুণ-তরুণীর ভালোবাসা কখনোই নিষ্পাপ-নিষ্কাম হয় না, হতে পারে না। তখন ভালোবাসা মানে কেবলই শরীর পাওয়ার সিড়ি। ভালোবাসা মানে শরীর জয় করার এক শৈল্পিক কৌশল। এর বেশি কিছু নয়। এ কারণেই শরীর জয় করার পর, বিশেষ

করে মেয়েদের পক্ষ থেকে কমন অভিযোগ, *তুমি আগে আমাকে আদর করে কতো কিছু বলতে আর এখন কেমন যেন বদলে গেছো।*

ছোট একটি ঘটনার কথা বলি। জেনেভার রাস্তায় ঘুরছি একা, ভাবছি নানান কিছু। সিগারেট টানছি অসম্ভব সুখে। রাস্তার পাশে বসেছি একটি খালি বেঞ্চে। চারদিকে সবুজের সমারোহ। এ এক অন্য রকম ভালো লাগা। আমাকে অবাক করে দিয়েই বেঞ্চের শেয়ার নিল এক তরুণী। বনলতা সেন সম্পর্কে জীবনানন্দ লিখেছেন অনেক কিছু। কিন্তু এটা নিশ্চিত, কবি এই মেয়েটিকে দেখেননি। ছোট চুলের জিন্স পরা এ মেয়েটিকে দেখলে নিশ্চিত কবির কবিতার ভাষা বদলে যেতো।

মা-বাবাসহ এই তরুণী বেড়াতে এসেছে ইটালি থেকে। জেনেভার রাস্তায় এখন ঘুরতে বেরিয়েছে একা। তাই দুজনেরই নিঃসঙ্গ সময়ে কথা বিনিময়। কৌতুকচ্ছলে হাত-বেহাতের খেলা। এভাবেই প্রায় তিন ঘণ্টা সময় পার। তারপর কথা হলো আবার দেখা হবে পরদিন, একই জায়গায়। দেখা হলো, কথা হলো। এভাবে প্রায় প্রতিদিন, পাচ দিন। তবে শরীরে শরীর মেলেনি তখনো, অথচ কথা হয় নিঃশ্বাসের দূরত্বে। বিশ-এর তরুণী সে। ব্রা ছাড়া তার স্তনের টলটলায়মান অবস্থা আমার দৃষ্টি এড়ায় না কিছুতেই কিংবা আমার আন্ডার গার্মেন্টসের ভেতর অপ্রাপ্তির আন্দোলনও কি তার চোখ এড়িয়েছে?

আজ তার সঙ্গে দেখা হওয়ার ষষ্ঠ দিন। ডিনার করেছি এক সঙ্গে। সে নাকি আজ থাকবে আমার সঙ্গে। ওয়েলকাম। আজ তাহলে হবে *ভালোবাসার* খেলা। সে কালই ইটালির প্লেন ধরবে। শুধু আজ রাতটা।

হোটেল রুমে শুধুই আমরা দুজন। এ কথা সে কথা। একটু খুনসুটি। তারপর সেই পুরনো কথাটি *আমি তোমাকে ভালোবাসি।* গভীর কামনা ওর চোখে মুখে বুকে।

উত্তরে আমার কি বলা উচিত? ভালোবাসি? আবার যদি না বলি তাহলে হয়তো দেহ ফসকে যাবে আর যদি বলি আমিও তোমাকে ভালোবাসি তাহলে এই শরীর আমার যেভাবে ইচ্ছে যেমন করে অন্তত আজ রাতের জন্য।

তাহলে কি ভালোবাসার নামে ভণ্ডামি করবো? আসলে ভালোবাসা মানেই তো ভণ্ডামি!

যাক, এখন অতশত ভেবে কাজ নেই। রাতের ঘড়ির কাটা অবিরাম চলছে সকালের দিকে। তার শুরু হলো ভালোবাসা-বাসি। বারকয়েক ভালোবাসার যুদ্ধ। সকাল হলো। হলো সুন্দর রাত শেষ।

সে বললো, আদিয়াস, গুড বাই।

এখন আমি ঢাকায়। সে হয়তো ইটালিতে অন্য কোনো রোনালদোর খেলা দেখছে। আমারও ভালোবাসা চলছে অবিরাম হয়তো অন্য কোথাও, অন্য কারো সঙ্গে।

তাহলে ভালোবাসা কি? আসলে ভালোবাসি টাইপের দুই একটি নরম কথা না বললে কি শরীর মেলে? মেলে না। দ্বিমত হয়তো অনেকেই করবেন। কিন্তু এটাই বাস্তবতা।

আসলে ভালোবাসা তেমন কিছুই না। এটি কেবলই একটি শব্দ। শব্দটি একটু সেনসেটিভ। এটি আলু, পটল, ডাল, তেল, লবণ এমন আরো আট -দশটা শব্দের মতোই একটা শব্দ। কেবল শব্দটির একটু সেনসিটিভিটির কারণে দেহ-মনে ক্ষণিকের উত্তেজনা বাড়ায়। জাস্ট লাইক ভায়াগ্রা।

যেমন সরকারের অনেক মন্ত্রণালয় আছে। ধর্ম, সমাজকল্যাণ, কৃষি, পাট, বস্ত্র, পানি ও সেচ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইত্যাদি। কোনো মন্ত্রণালয়ের চেয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব কম নয়। মর্যাদাও কম নয়। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুনলেই আমরা একটু নড়েচড়ে বসি। শুধু এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের একটু সেনসিটিভিটির কারণেই। তাই নয় কি? ঠিক ভালোবাসা শব্দটির মতোই।

ভালোবাসা খুবই ঠুনকো একটি বিষয়। এ কারণেই আমরা কথায় কথায় বলতে পারি, *তোমাকে প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেলেছি।* খুব সহজ একটি বিষয় বলেই এভাবে বলে ফেলা যায়। ভালোবাসার সরস বর্ণনা দিয়ে যতোই বর্ণমালা গাথা হোক, এর সাফল্যের ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। হাজার কোটি বয়সের পৃথিবীতে তথাকথিত ভালোবাসার সফল ঘটনা কয়টি? দীর্ঘদিন থেকে শুনে আসা লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, রোমিও-জুলিয়েট কিংবা আনারকলি-সেলিমের কাহিনী এসবই হাতেগোনা।

ঘটনাগুলো যদি সত্যও হয় তাহলে ব্যতিক্রম। এ কথা তো আমরা সবাই জানি, ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হয় না।

অপরদিকে ভালোবাসা যে কেবলই শরীর জয়ের এক কার্যকর মন্ত্র।

ভালোবাসার চেয়েও বরং আরো তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দ রয়েছে। সেটি হলো *বিশ্বাস*। যাকে বিশ্বাস করা যায় তাকে হয়তো ভালোবাসাও যায়। কিন্তু যাকে কোনো কারণে ভালোবাসা যায় তাকে বিশ্বাস নাও করা যেতে পারে।

ভালোবাসা শব্দটির চেয়ে *বিশ্বাস* শব্দটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। নয় কি?

আসলে ভালোবাসার রসায়ন শরীরের সঙ্গে। মনের সঙ্গে সাময়িক। মনের সঙ্গে এর গভীর সংমিশ্রণ মানুষ মেরে জেএমবি-র বেহেশত পাওয়ার ঠুনকো বিশ্বাসের মতো। মানুষের মনের পরিবর্তনের সঙ্গে ভালোবাসার হিসাব-নিকাশেরও পরিবর্তন ঘটে। এ কারণেই একজন কিশোর যখন তারুণ্যের পথে যেতে থাকে, তার ভালোবাসার উত্তাপও বাড়তে থাকে সমান তালে। যখন প্রৌঢ়ত্বের দিকে মানুষ পা বাড়ায়, একইভাবে উত্তাপ কমতে থাকে কথিত ভালোবাসার।

আমার এ মতের সঙ্গে হয়তো দ্বিমত করবেন অনেকেই। তবে এ বিষয়ে বক্তব্য-মন্তব্য যার যা-ই হোক, মানুষের জীবনে ভালোবাসার নামে শরীর পাওয়ার এই চিরন্তন মন্ত্র থাকবে আমৃত্যু। আমিও ব্যতিক্রম নই। আমি তো কোন ছার, রবিঠাকুরও তো কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেননি ভালোবাসার সংজ্ঞায়। অগত্যা গান ধরেছেন *সখী ভালোবাসা কারে কয়...*

আসলে ভালোবাসা কিছুই নয় ভালোবাসা হলো সাত টাকার *যায়যায়দিন* ১৪ ফেব্রুয়ারিতে এসে ত্রিশ টাকা।

ঢাকা থেকে
creation_2003@hotmail.com

গিফট

খুব ছোটবেলা থেকে নামাজ-রোজাসহ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোরআন হাদিস অনুসারে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। প্রেম, ভালোবাসা আমার অপছন্দনীয় কাজ। (সঠিক বলতে পারবো না) কোরআন হাদিসে এর সমর্থন নেই মনে হয়। যদি থাকতো তাহলে ইউসুফ (আ.)-কে যখন কূপ থেকে তুলে নিয়ে গেল একটা লোক পালিত পুত্র করার জন্য, পরে ওই লোকের স্ত্রী তার (ইউসুফ) প্রতি আসক্ত হয়ে জুলেখা যখন ঘরে আটকালেন ইউসুফ (আ.) কেন *নাউযুবিল্লাহ* বলে বেরিয়ে এসেছিলেন? সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে ইউসুফ (আ.) প্রেমে পড়েননি।

যখন প্রাইমারিতে পড়তাম তখন থেকে *প্রেম* নামের বিরক্তিকর কথাটা শুনে আসছি। এখন পর্যন্ত আমার মনের এতোটুকুও পরিবর্তন হয়নি। কোনোদিন স্কুলের স্পোর্টস-এ খেলিনি কারণ চারপাশে কতো পুরুষ আমার খেলা দেখবে। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো পুরুষের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করি।

হিন্দু একটা মেয়ের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হলো। তার কাছেই আমার মনের কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারতাম, সেও আমাকে বুঝতো। কিন্তু একদিন একটা ইসলামি মাসিক পত্রিকায় দেখতে পেলাম হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়। কষ্ট হলেও বন্ধুত্ব রাখলাম না যেহেতু সবার উপরে আল্লাহ রাসুলের কথা। তারপরও যখন কেউ প্রেম নিবেদন করে তাকে যে কি বলা উচিত তা আমার জানা নেই।

একটা ঘটনা বলি, এক স্যার (যার কাছে প্রাইভেট পড়তাম) আমাকে পছন্দ করেন কি জন্য জানি না। সেটা বেশ আগেই বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু ওসবের ভেতর জড়াতে চাই না, তাই না বোঝার ভান করতে থাকি।

একদিন আমাকে সরাসরি বললে আমি আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বললাম। বাবা-মা পছন্দ করলে আমার আপত্তি নেই। তারপরও স্যার কয়েকটা পরীক্ষা করেছেন তাতে নাকি আমি ফেইলিওর হয়েছি। আমার কাছে অবশ্য ফেইলিওর মনে হয়নি কারণ পরীক্ষাগুলো শরীয়তসম্মত ছিল না, তাই। স্যারও ছিলেন ধার্মিক কিন্তু খুব বললে মনে হয় ভুলই হবে তবে মোটামুটি। একবার ঈদে আমাকে একটা মোবাইলের সিম গিফট দিলেন। তখন আমার মোবাইল ছিল না।
যাহোক, নিরুপায় হয়ে নিলাম। কয়েক দিন ভেবে দেখলাম নেয়াটা ঠিক হবে না, কারণ প্রাপ্তবয়স্ক একটা মেয়ে হয়ে কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষের কাছ থেকে কিছু নেয়াটা মন সায় দিল না! তাই ফেরত দিলাম। এতে দুঃখ পেয়েছেন হয়তো। কিন্তু আবেগ দিয়ে তো জীবন চলে না। কাউকে পছন্দ করা বা কোনো ছেলের সঙ্গে প্রেম করা, ঘুরতে যাওয়া- এসব আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করে না। আমার মতে, প্রেম ভালোবাসা বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে করা উচিত প্রত্যেক মেয়েরই। বিয়ের আগে এসব রং-তামাশা না করলে কি এমন ক্ষতি? তাহলে যে গিফট নিলাম না বা পরীক্ষাতে ফেইলিওর হলাম এতে আমার দোষ বা অন্যায়টা কোথায়? একটা অন্যায় বা পাপের পথে পা বাড়াতে চাইনি- এটাই কি আমার দোষ?
সব মানুষের একটা দুর্বল জায়গা থাকে, আমার দুর্বল জায়গা হলো কেউ আমার ওপর রাগ করলে খুব কষ্ট লাগে। সামান্য দুঃখ যদি সে পেয়ে থাকে আস্তে আস্তে ভুলে যাবে হয়তো কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার আমারই হবে। তাই লেখার মাধ্যমে স্যারকে বলতে চাই, আমার কোনো কথা বা আচরণে যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন, প্লিজ ক্ষমা করবেন। আসলে আমার বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না। তাইতো মনের কথাগুলো কাউকে বলতে পারিনি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অভিমানী

শোভন

সে খুব অভিমানী। অল্পতেই রেগে যায়। ফোন করতে দেরি হলে রেগে যায় আর খুব সন্দেহ করে। কোনো কথাই সহজে বিশ্বাস করে না। যার সম্বন্ধে এতো দুর্নাম করছি তার নাম আদৃতা। তার সঙ্গে আমার পরিচয় চিঠির মাধ্যমে। ক্লাস টেনে উঠেছি মাত্র। সেই সময় ৬ জানুয়ারি তার প্রথম চিঠি পাই। চিঠিতে লেখা ছিল আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। আমি আপনার সঙ্গে পত্রমিতালী করতে চাই।
চিঠিটা পড়ে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। কারণ এটিই ছিল কোনো মেয়ের লেখা প্রথম চিঠি। তবে দুঃখের ব্যাপার, প্রথম চিঠিটাই আমার ভাইয়ার হাতে পড়েছিল। তারপর আমি চিঠির উত্তর পাঠাই এবং সঙ্গে ফোন নাম্বারও দিই। চিঠি পেয়ে সে প্রথমবারের মতো ফোন করে। ফোন করেছিল ঈদের আগের দিন। বাসায় সবাই ছিল। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব শুরু হয় চিঠি ও ফোনের মাধ্যমে। ঘন ঘন চিঠি আসায় বাবা-মা বিরক্ত হতেন।
তার আর আমার বাসা ছিল অনেক দূরে। দূরের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বেশ ভালো লেগেছিল।
সময় গড়াতে থাকে, প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শেষ হয়। বাসায় চিঠি আসায় বাবা-মা রাগ করেন বলে তার সঙ্গে যোগাযোগ হতো ফোনে।
প্রতি শুক্রবার সকাল দশটায় ফোন করতাম আর সে ফোন করতো মঙ্গলবার বিকাল পাচটায়। এভাবে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব চলতে থাকে। এভাবে প্-টেস্ট পরীক্ষাও শেষ হয়। সামনে টেস্ট পরীক্ষা, পড়াশোনার চাপ বেড়ে যায়। তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ কমে যায়। বেশি ফোন করতে পারতাম না। সে মাঝে মধ্যে ফোন করতো। কিন্তু বাসায় এ সময় কোনো ফোনই রিসিভ করতে পারতাম না। করলেও কথা বলতে পারতাম না কারণ সামনে মা থাকতেন।

মা তাকে অনেক বকা দিয়েছেন এবং ফোন করতে মানা করেছেন। আমি এ সময় মাঝে মধ্যে তার এক আত্মীয়ের নাম্বারে ফোন করতাম বাইরে থেকে। ফোন না করার জন্য সে অনেক রাগ করতো। তবে এটা সত্যি, সেই আমার একমাত্র মেয়ে বন্ধু।

রোজা শুরু হয়ে যায়। রোজার পরেই টেস্ট পরীক্ষা। তার সঙ্গে কথা হয় ঈদের দিন। সেদিন তাকে বলেছিলাম, আমার আরেকটা মেয়ে বন্ধু আছে। কথাটা শুনে সে কষ্ট পেয়েছিল। তারপর অনেক দিন ফোন করেনি। এমনকি আমার জন্মদিনেও না। আমার জন্মদিনে তার কোনো ফোন না পেয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। তারপর আমাদের কথা হতো মাঝে মধ্যে। তবে তার কথা আমার সব সময় মনে থাকতো। আমাদের বন্ধুত্ব চিরকাল অটুট থাক তাই চাই। ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাই শুভেচ্ছা। তোমার কথা আমার ভালো লাগে। তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকবো সব সময়। কিন্তু আপাতত না। কারণ মার্চ মাসেই আমার এসএসসি পরীক্ষা। যে ভাবেই হোক ই+ পেতে হবে। সে জন্য এখন আর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। আমাকে ভুলে যেও না। আমার পরীক্ষা শেষ হলে তোমাকে আবার চিঠি লিখবো, ফোন করবো।

আমার জন্য দোয়া করবে যাতে ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারি। আমাদের বন্ধুত্ব চিরকাল অটুট থাক। এই পড়ন্ত বিকেলে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ভালোবাসা।

হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শেরশাহ রোড, ঈশ্বরদী থেকে

নায়াগ্রা

দেলওয়ার হোসাইন

১৯৯৮–র জানুয়ারিতে কানাডার ভিসা শেষ হয়ে যাবে। দিল্লি থেকে ভিসা নেয়া সহজ কথা নয়। প্রসঙ্গত তখন ঢাকায় কানাডিয়ান কনসুলেট ছিল না। তাই ঝামেলা এড়াতে জানুয়ারির প্রচণ্ড শীতেই নৌকার মাঝিদের মতো বদর বদর বলে রওনা হলাম টরন্টোর উদ্দেশে। টরন্টো শুধু কানাডারই নয়, বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ নগরীর একটি। নাগরিক সুবিধা, আরাম ও নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের জন্য।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস থেকে বিশাল দেহের কে এল এম বিমানে পৌছলাম টরন্টো এয়ারপোর্টে রাত নয়টায়। শহর থেকে দূরে বিরান মাঠে এ এয়ারপোর্ট।

আনুষ্ঠানিকতা শেষে টার্মিনাল ভবনের বাইরে বেরুতেই মাইনাস ২৬–২৭ ডিগ্রির তীব্র শীত হাজার হাজার সুই হয়ে সম্পূর্ণ মুখ এবং হাতের দশ আঙুল, যা বাদর টুপি ও চামড়ার জ্যাকেটের হাতার বাইরে ছিল, আকুপাংচার করে ফেললো। জীবনে এই প্রথম টের পেলাম শীত কাকে বলে।

হোসেন আলী ছোট ভাইয়ের বন্ধু, আমার মাকে সে আপন খালার মতোই দেখতো। তার বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল আমাকে রিসিভ করতে। দৌড়ে তার গাড়িতে উঠলাম।

দেড় মাস কানাডার অন্টারিও প্রদেশের (রাজধানী অটোয়া) টরন্টোতে হোসেন আলীর বাসায় থাকা হলো। শীতের জন্য টরন্টোর বাইরে যাওয়া হয়নি। এস্কিমোদের মতো পোশাক পরে টরন্টো টাওয়ারের অদূরে টরন্টোর বৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ডাউন টাউনেই বেশি যাওয়া হতো। বিশেষ করে এখানের ইটন সেন্টারে।

ইটন সেন্টার একটি আলিশান মল। এটির চার পাচ তলা গ্রাউন্ড লেভেলের নিচে। মাটির উপরে আট দশ তলা হবে। আয়ত আকৃতির মলের অর্ধাংশে একটি কম্পানির বিপণি বিতান। এক ফ্লোরে জাতীয় পণ্য। যেমন পঞ্চম তলায় শুধু পারফিউম।

বাকি অর্ধেকের মধ্যাংশ ফাকা। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে দশ তলার ছাদ পর্যন্ত। ফাকা চতুর্দিকে রেস্তোরা, কাফে এবং নানা ধরনের সুভেনির ও কৃত্রিম-অকৃত্রিম ফুলের দোকান। মলের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় ক্যাপসুল লিফট ও এস্কেলেটর আছে।

ডাউন টাউনে বড় বড় বাণিজ্যিক ভবন, সিনেমা কমপ্লেক্স বাদেও সব ধরনের রিকৃয়েশনের ব্যবস্থা আছে। এগুলো একটি এলাকায়ই বেশি কেন্দ্রীভূত।

চার পাচটি বিপণি, ব্যাংক এবং অন্যান্য দোকানের পর হয় একটি নীল ছবির হল, না হয় স্ট্রিপটিজ বার পাওয়া যাবে। এ স্ট্রিপটিজ বারগুলোতে বোধহয় সব কিছুই হয়ে থাকে।

একদিন একাকী গেলাম এক বারে। শখ, চেনা লোকের চোখের অন্তরালে জীবনে প্রথম স্ট্রিপটিজ নাচ দেখা। নৃত্যমঞ্চ থেকে দূরে এক টেবিলে বসলাম নাচ দেখার জন্য। যেহেতু বার, সুতরাং এক পেগ বিয়ারের অর্ডার দিতেই হয়। অর্ডার নিতে আসা পেন্টি ও নামমাত্র ব্রা পরিহিত এক লোভনীয় দেহের ষোড়শীকে জানালাম অভিপ্রায়। বিয়ার এলো। দাম বাইরের দ্বিগুণ। চার কানাডীয় ডলার মাত্র।

মঞ্চে বিভিন্ন বয়স ও দেহের নৃত্য পরিবেশনকারী এসে ২০ মিনিটের মতো নামমাত্র পোশাকে নৃত্যের পর তা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। তারপর মিনিট দশেক জন্মদিনের পোশাকে সবাইকে প্রচুর আনন্দ দিয়ে অন্তর্হিত হয়। আরেকজন আসে। সামনের প্রথম সারিতে মধ্য বয়স থেকে উপরের বয়সীদের সমাগম বেশি মনে হলো।

অপরদিকে মদ পরিবেশনকারিণীরা একজন করে এসে পানরতদের নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করছে তারা ফান করবে কি না। তার জন্য অতিরিক্ত ২০ অথবা ৪০ ডলার দিতে হবে। ফান করার জন্য বার সংলগ্ন রুমে যেতে হবে।

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ৪০ ডলারের ফান করার জন্য আমাকে কতো দূর যেতে হবে।

উত্তরে সে জানালো, এজ ফার এজ ইউ লাইক। আর ২০ ডলারে? মাত্র স্পর্শ আনন্দ। নো পেনেট্রেশন।

সাবওয়ের ইয়াজ স্টেশনের অদূরে ভবঘুরেদের রাত যাপনের একটি বড় ভবন আবিষ্কার করলাম একদিন। ভেতরে সুবিধাদি সম্পর্কে খোজ নিইনি। তবে সূর্যাস্তের আগেই ওই ভবনের সামনে জোড়ায় জোড়ায় ভবঘুরেরা ফুটপাথে জমা হতে আরম্ভ করে। রাত যতো নামতে থাকে তাদের ভিড় ফুটপাথ থেকে গাড়ি চলাচলের রাস্তায় নেমে আসে। প্রচণ্ড শীতে তারা গল্পে মুখরিত হয়। কারো হাতে থাকে সফট বা হার্ড ড্রিঙ্কের ক্যান। সেই সঙ্গে তারা সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের চুমু দেয় ও পান করে। ক্লান্ত হয়ে বিনা পয়সার হোটেলে ঢুকে রাত যাপনের জন্য।

একদিন টরন্টো মূল শহরের ২০ থেকে ২৫ মাইল দূরে ম্যাসাসাগা নামে একটি উপশহরে গিয়েছিলাম। এটা ইনডিয়ান পাঞ্জাবের অধিবাসীদের এলাকা। কেন্দ্রে একটি বিশাল মল আছে। ক্রেতা-বিক্রেতা তারাই। মলের সিনেমা কমপ্লেক্সে এক সঙ্গে ৫-৬টি হিন্দি সিনেমা চলে। সেখানে শাহরুখ খান, মাধুরী দীক্ষিত ও কারিশমা কাপুরের *দিল তো পাগল হায়* সিনেমাটি দেখি। *টাইটানিক* সিনেমাটিও প্রথম দেখি টরন্টোতে ইটন সেন্টারের সিনেমা কমপ্লেক্সে।

ছয় মাস কানাডায় থাকার অনুমতি থাকলেও মাস দেড়েক থাকা হলো টরন্টোতে। শিগগিরই যাবো নিউ ইয়র্কে। হোসেন আলী পরামর্শ দিল ১০-১১ কিলোমিটার রাস্তার ভ্রমণ বাসে উপভোগ করে যেতে। যদিও আমাকে বাসে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পাশ ঘেষেই নিউ ইয়র্ক যেতে হবে কিন্তু বাস সেখানে থামবে কয়েক মিনিটের জন্য। নিউ ইয়র্ক যাওয়ার আগে একদিন নায়াগ্রা দেখতে বেরোই। একা। আমার পক্ষে নায়াগ্রার বর্ণনা দেয়া সামান্য সহজ হলেও এর সৌন্দর্য প্রকাশ সম্ভব নয়।

নির্দিষ্ট দিনে কানাডার বিভিন্ন প্রদেশ ও নিউ ইয়র্কগামী ডাউন টাউন বাস স্টেশনে হাজির হলাম সকাল নয়টায়। ভিক্টোরিয়া আবাসিক এলাকার একটি ৩৪ তলা ভবন, নাস কৃসেন্ট প্লেস থেকে হিসাব করে সাবওয়ে চড়ে কাটায় কাটায় পৌছাই। নয়টার ১০ মিনিট আগে বাসে উঠলাম। ড্রাইভার যাত্রীদের

মালামাল বাসের তলার খোলে ঢোকালো। টিকেট চেক শেষ হলে চালক আমেরিকান বর্ডারে ইমিগ্রেশন চেকআপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিল মাইক্রোফোনে।

কাটায় কাটায় সাড়ে নয়টায় বাস চলতে শুরু করলো। বাস শহর ছেড়ে ছোট বড় স্থাপনা, শস্যের মাঠ পেরিয়ে আধাঘণ্টা গেল দক্ষিণ-পূর্বে। তারপর অন্টারিও লেকের দিকে মসৃণ হাইওয়ে ধরে ছুটে চললো। বাসে বসে মনে হলো প্লেনেই যাচ্ছি। রাস্তা এতো মসৃণ যে, মনে হচ্ছিল বাস বাতাসের ভেতর দিয়ে উড়ে ছুটছে। অর্ধেক ভর্তি বাসে কোনো শব্দ নেই। সবাই বোবা হয়ে বসে আছে।

শত হলেও বাঙালি। কতোক্ষণ বোবা হয়ে বসে থাকা যায়? তাই পাশে বসা দক্ষিণ ইনডিয়ান এক শ্যামলা তরুণীকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি কানাডার স্থায়ী বাসিন্দা? ইনডিয়ার কোন প্রদেশে তোমার বাড়ি? তার উত্তর, আমি ইনডিয়ান নই। কানাডায় এসেছিলাম বেড়াতে। আমি সুরিনামের অধিবাসী।

আমি জানি সুরিনামের অর্ধেক অধিবাসীই ইনডিয়ান। দেড়শ দুশ বছর আগে বৃটিশরা সেখানে সেটল করার স্কিম নেয় এবং তার ফলে সুরিনাম, বৃটিশ গায়ানা ও ত্রিনিদাদ টোবাগোতে দক্ষিণ ইনডিয়ানদের সংখ্যা অর্ধেকের মতো। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই আছে। তাই তরুণীকে জিজ্ঞাসা করলাম, নিশ্চয়ই তোমার আগের পুরুষ ইনডিয়ান?

সে নির্দ্বিধায় উত্তর দিল, আই ডোন্ট নো। এরপর তার সঙ্গে কথা বাড়ানো যায় না। তাই চুপ হয়ে গেলাম। দুই আড়াই ঘণ্টা কিভাবে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। দেড়শ দুশ কিলোমিটার রাস্তার কোথাও ক্রসিং সিগনাল পেরোতে হয়নি।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত নিচে পড়ে যে নদীর সৃষ্টি হয়েছে সেটির নাম মনে নেই। নদীর ঢালে প্রায় পানির কাছে বাস আমাদের দুই যাত্রীকে নির্দিষ্ট স্টপে নামিয়ে দিল। ওখান থেকে সমতল ভূমি অনেক উচু। সমতলে পর্যটকদের জন্য গড়ে উঠেছে হোটেল, মোটেল, রেস্তোরা ও নানান পণ্যের দোকান। অনেক উচু টাওয়ারের ছাতার মতো মাথায় একটি ক্যাসিনোও। নদীর অপর পাড়ে হ্রদের একাংশ দেখা যাচ্ছে।

হতবাক হয়ে দাড়িয়ে আছি। দৃষ্টি সীমায় দ্বিতীয় কোনো প্রাণী দেখছি না। সঙ্গের যাত্রী একজন জাপানি তন্বী। আমি হাত-পা ঝাড়া। একটি ক্যামেরা ছাড়া কিছুই আনিনি। সঙ্গিনীর সঙ্গে একটি বড় কাধব্যাগ আরেকটি ট্রাভেল ব্যাগ। ট্রাভেল ব্যাগটি মনে হলো ২০-২৫ কেজি হবে। একা তার পক্ষে সেটি বহন করা সম্ভব নয়। সে মনে করেছিল ডাক দিলেই ট্যাকসি ক্যাব পাবে। কিন্তু গরুর গাড়িও দেখা যাচ্ছে না।

ভিন দেশি শাদা চামড়ার তন্বী তরুণী। আমি বাদামি বাঙালি। আগে কথা বলে কোন বিপদে পড়ি ভাবছি। আগে থেকে কথা বলে যদি উত্তর না পাই তবে সে অপমান হজম করবো কিভাবে? সে কি নেচারের মানুষ কথা না বললে বুঝবো কি করে? আমি মানুষ খোজার মতো এদিক সেদিক তাকাচ্ছি। কিন্তু মহারানী ১০ মিনিটেও কোনো বাক্য ব্যয় করলেন না।

আমি উপরে উঠবো। খুবই অভদ্র দেখায় এজন্য বলেই ফেললাম, মে আই হেলপ ইউ?

এবার তার চোখ বললো, তোমাকে আবার কষ্ট দেবো।

বললাম, এখানে এই তীব্র শীতে কাকপক্ষীও পাওয়া যাবে না। চল উপরে যাই।

সে তার ছোট ব্যাগটি কাধে নিল। বড় ব্যাগটির একদিকের ফিতা সে ধরলো, আরেক দিকে আমি। এবার তার মুখে হাসির আভা দেখা গেল। সমতলে এসে দুই বুড়িকে পেলাম। সে জিজ্ঞাসা করলো কোথায় ভালো হোটেল পাওয়া যাবে। বুড়িদের কথামতো এক হোটেলে গেলাম। ভাড়া অনেক বেশি। তাই সে মোটেলে উঠবে। আধঘণ্টা হেটে মোটেল পাওয়া গেল। চার পাচশ রুমের দ্বিতল মোটেল।

মনে হলো আর কোনো বোর্ডার নেই। চাবি দিয়ে তার রুমে সে ঢুকলো। আমি সরে যাবো ভাবছি। সে বললো, চলো ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে এক সঙ্গেই নায়াগ্রা দেখতে বেরোই। ইতিমধ্যে তার কানাডায় আসার উদ্দেশ্য, পেশা ও অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে। বাথরুমে গিয়ে সে রিফ্রেশ হলো। এরপর আমি ঢুকলাম মুখ-হাত ধুতে।

বের হয়ে একটি মোটামুটি ভালো রেস্তোরায় পিৎসাসহ চা খেলাম। সে অর্ধেক দাম দিল। আমি অর্ধেক। রসিক পরিবেশনকারিণীকে টিপসটা আমিই দিলাম। নায়াগ্রা দেখে সে পাগল হয়ে গেল। আমি আর তখন তার একজন বৃদ্ধ সঙ্গী নই। আমাকে জড়িয়ে ধরে সে ব্যাকগ্রাউন্ডে জলপ্রপাত রেখে তার ক্যামেরায় অনেক ছবি তুললো অন্য দর্শনার্থীদের দিয়ে। অনুরোধ করে।

আমেরিকার নায়াগ্রা নদী কানাডীয় সীমান্তে এসে ছোট্ট একটা সরু দ্বীপ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে দুটি পৃথক স্রোতধারায় নিচে নেমেছে। তার ওই উচ্ছ্বাস ছিল ছোট ধারাটির পতন দেখেই। বড় ধারাটি প্রধান জলপ্রপাত। আমাদের থেকে সাত আটশ গজ পশ্চিমে। বড় ধারাটি আমেরিকান ও কানাডীয় ভূখণ্ডে একটি ঘোড়ার ক্ষুর সৃষ্টি করে প্রতি সেকেন্ডে দেড় লাখ গ্যালন পানি একটি ২০ তলা ভবনের সমান উচু থেকে নিচে পড়ে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করছে।

পানি নদীতে পড়ে তীব্র চাপে গোড়ায় বৃষ্টি ও আধামাইল ওপরে ঘন কুয়াশা সৃষ্টি করছে। পানির ঝাপটা কানাডীয় বর্ডারে এসে শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে। এ পাড়ের গাছপালার ডালে বৃহৎ আকৃতির ঈগলু আইসক্রিম সৃষ্টি করছে। কোনো কোনো গাছের শাখা জমানো বরফের ভারে ভেঙে পড়ছে। আমরা প্রায় মাইলখানেক পশ্চিমে গিয়ে এ দৃশ্য দেখে হতবাক ও মহা খুশি হলাম।

আকেমি ইদেউ (তন্বীর নাম) শীত উপেক্ষা করে হিমাঙ্কের নিচে ঠাণ্ডা কুয়াশায় ভিজে অনেক আনন্দ উপভোগ করলো। সেখানে কয়েক হাজার শিশু ও নানান বয়সী নারী-পুরুষের দেখা পেলাম। এমন সুন্দর মেলা জীবনে দেখেছি বলে মনে হয় না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জলপ্রপাত দেখে, ছবি তুলে ও আনন্দ করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আমরা হেটে যেখানে বাস থেকে নেমেছিলাম সেদিকে এলাম।

উল্লেখ্য, সেই ১৯৯৮ সালে যায়যায়দিনের জন্য অনেক পরিশ্রম করে লিখেছিলাম ভ্রমণ এবং অনুভূতির কথা। এক জায়গায় লিখেছিলাম, তখন মনে হলো আমি যেন ৩১ বছরের যুবক। তাকে দু-একবার জড়িয়ে ধরেও নিবিড় সান্নিধ্যে যৌবনের আনন্দে অবগাহন করেছিলাম কয়েক ঘণ্টার জন্য।

আমার গিন্নি অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। স্ট্রিপটিজ বারের কথা সেবার না লিখলেও লেখাটি সে তার পরিবারের সবাইকে দেখিয়ে ছিড়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে তার কানে গরম গলিত সিসাঢালা মন্তব্যগুলো লেখা গেল না। পাঠকদের চিন্তাশক্তির ওপর ছেড়ে দিলাম। সন্ধ্যায় আকেমিকে তার মোটেলে পৌছে দিয়ে টরন্টোতে ফিরে এলাম।

সেই মেয়ে আমাকে রাতে আলো ঝিলমিল নায়াগ্রা দেখার কথা বলেছিল। তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য বলেছিলাম, আমার তো মোটেল বুক নেই। উত্তরে সে তার রুমে রাত যাপনে কোনো অসুবিধা হবে না বলে আমাকে থাকতে অনুরোধ করেছিল। আমি ভয়ে পালিয়ে বেচেছিলাম।

গোপীবাগ, ঢাকা থেকে

অমানুষ

মোহাম্মদ নাজমুল আলম খান রাফী

১৪ ফেব্রুয়ারির দুপুর। ব্যস্ত রাস্তাটিতে অন্যান্য দিন এ সময় তেমন কোলাহল থাকে না। কেমন যেন একটা নীরবতা আচ্ছন্ন করে রাখে পরিবেশটাকে। কিন্তু অন্যান্য দিনের চেয়ে আজকের দুপুরটা যেন একটু ব্যতিক্রম। কিছুক্ষণ পর পর জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ হাত ধরা-ধরি করে এই রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছে। শুধু যে নারী-পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় যাচ্ছে তা নয়, সাধারণ পথচারীরা কেউ একা কেউ বা দল বেধে হাটতে বের হয়েছে। কারণ একটাই, এ দিন হলো একটা বিশেষ দিন - ভালোবাসা দিবস। তাই কেউ এ দিবস উদযাপন করতে, আবার কেউ সাধারণত কৌতূহলবশত দিবসটি কিভাবে পালন হয় তাই দেখতে বের হয়েছে।

রাস্তার এক পাশের ফুটপাথে কিছু ছেলে বসে আড্ডা দিচ্ছে। তাদের পাশ দিয়ে কেউ গেলেই তার সম্বন্ধে কোনো না কোনো মন্তব্য করছে। বিশেষ করে কোনো নারী-পুরুষ যুগল তাদের পাশ দিয়ে গেলে সমালোচনার মাত্রা যেন আরো বেড়ে যায়। সেসব মন্তব্য ও সমালোচনা শুনে তালি দিয়ে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে।

পথচারী কেউ কেউ বিরক্তিভরা দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু সাহস করে কেউ কিছু বলছে না। যেন বিরক্তি প্রকাশের মাধ্যমে তারা নীরব প্রতিবাদ করছে। ছেলেগুলো যে বখাটে তা অবশ্য বুঝতে বাকি রইলো না কারো।

বখাটে ছেলেদের পাশেই একটা কুকুর ঘুমাচ্ছিল। দুপুরের এ সময়টাতে বিশ্রাম নেওয়াটা ওই কুকুরটির উদ্দেশ্য ছিল।

কয়েকটি মেয়ে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেরা এবার কোনো মন্তব্য করলো না। তারা মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শিস দিতে লাগলো। কিন্তু মেয়েরা মোটেও তাদের দিকে তাকাচ্ছিল না।

ছেলেরা ব্যর্থ হয়ে এবার একটি নতুন পন্থা অবলম্বন করলো। তারা তাদের হাতের জ্বলন্ত সিগারেট ঘুমন্ত কুকুরের গায়ে চেপে ধরলো আর কুকুরটি চিৎকার করে জেগে উঠলো এবং ভয়ে দৌড়ে তাদের থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল। যেতে যেতে গোঙানির মতো আওয়াজ করছিল কুকুরটি।

এবার মেয়েরাও ভয় পেয়ে গেল। তারা সেদিকে না তাকিয়ে পারলো না। ছেলেদের দিকে তাকানো মাত্রই তারা দাত বের করে হাসতে লাগলো।

একটা মেয়ে ঘৃণার স্বরে বলেই ফেললো, এরা কি মানুষ?

ছেলেগুলো তখনো হাসছিল। মনে হলো কথাটা তাদের বোধগম্য হয়নি। হয়তো মানুষ নয় বলেই বুঝতে পারেনি।

ছেলেগুলো এবার দূরে দাড়িয়ে থাকা কুকুরটিকে দেখলো। তাদের মনে হলো কুকুরটি ভয় পেয়ে তাদের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। এতে তারা আরো মজা পেল। কিন্তু তারা বুঝতেই পারলো না, কুকুরটির চাহনিতে মানুষের মতো দেখতে এই নিকৃষ্ট জঞ্জালগুলোর প্রতি কি তীব্র ঘৃণা ছড়িয়ে আছে।

ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসা যেন মানুষে মানুষে তথা নারী-পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, তা যেন ছড়িয়ে পড়ে সব জীবের প্রতি। এদিনটি যেন সব জীবের প্রতি মায়ামমতা ও ভালোবাসা জন্মানোর উৎসাহ জোগায়। আর এ দায়িত্ব নিতে হবে মানুষকে। কারণ তারাই তো স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়েও নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের জন্য অসহায় বোবা প্রাণীর ঘৃণার পাত্র যেন তাদের না হতে হয়। এ তো মনুষ্যত্বের অপমান। তাই ভালোবাসা সবার জন্য।

পূর্ব বাড্ডা, ঢাকা থেকে

সংসার

ফাকিহাজ্জামান

তুমি কিছু বলবে রহিমভাই? সেই কখন থেকে চুপ করে বসে আছো, কিছু বলছো না।

রহিমভাই আমার একটা হাত টেনে নিয়ে তার মুঠোবন্দী করলো।

তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, বেচারা ঘামছে। কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা যে বলতে ঘামতে হয়?

চিনু, আজ চাচা চাচিকে আমার বিয়ের কথা বলবো।

ওহ এটা বলার জন্য এমন হেজিটেট করছো! বলো না, এটা তো খুবই খুশির কথা। পাত্রী দেখতে কেমন, কোথায় থাকে, তোমার পরিচিত?

তুই বুঝতে পারছিস না, আমি কার কথা বলতে চাচ্ছি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো রহিমভাই।

কার কথা বলছো? অবাক হলাম তার কথায়।
তুই আমাকে এখনো বুঝতে পারলি না।
বাজে কথা রাখো। এ পৃথিবীতে তোমাকেই আমি সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারি। সব খুলে বলো। তোরে।
আমাকে বিয়ে করছো মানে কি?
মানে সহজ, তোর আর আমার বিয়ের কথা বলছি।
কি!
হ্যা, তোকে বিয়ে করবো। এখন তোর পরীক্ষা শেষ আর মা চাচ্ছিল আমি বিয়ে করি। এতোদিন তোর পরীক্ষা ছিল তাই বলতে পারিনি।
কি বলছো এসব, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
আজ চাচা চাচিকে বলবো আমরা বিয়ে করবো। মা আসবে ডেট করতে। মায়ের শরীর ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, বলছিলেন মেয়ে দেখার কথা– তোর কথা বলাতে মা সানন্দে রাজি হলেন।
ও মাই গড, এসব তুমি কি বলছো রহিমভাই? তুমি আমার সব জেনেও এমন সিদ্ধান্ত নিলে?
হ্যা নিলাম, তাতে সমস্যা কোথায়?
রহিমভাই, তুমি আমার সব জানো। তাই আমাকে করুণা করছো?
করুণা! ছি চিনু, করুণা করবো কেন? তোকে ভালো লাগে তাই বিয়ে করে জীবন সঙ্গী করতে চাইছি, তাতে করুণার কি আছে?
করুণা নয়তো কি, এমনিতেই তুমি যা করেছো তা শোধ দিতে পারবো কি না জানি না। সেগুলোর প্রতিদান হিসেবে যদি আমার শরীরটা চাও তা হলে বিয়ে না করেই ভোগ করতে পারো।
ছি চিনু! তুই আবোল তাবোল এসব কি বলছিস। তোকে কোনোদিন করুণার পাত্রী ভাবিনি, করুণা করিনি। তোকে সেই ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসি। কখনো বলিনি ঠিকই, তোকে যে ভালোবাসি সেটা তুই যেমন জানিস আমিও জানি। তোর সমস্যা হয়েছে আজ কয় বছর কিন্তু তার আগেই তোকে ভালোবাসি, সেটা কি করুণার পর্যায়ে পড়ে, বল?
তারপরও চাই না তোমার সুন্দর ভবিষ্যৎ আমার জন্য অপূর্ণ থাকুক। তুমি সংসার নিয়ে সুখে থাকো এটা আমি চাই।
কিসে যে সুখ তা আমাকে শেখাতে হবে না। বিড় বিড় করে বললো রহিমভাই।
বাসায় ফেরার পথে সে কোনো কথা বললো না, শক্ত হয়ে বসে রইলো। আমিও কিছু বললাম না। আমি চাই এখন থেকেই সে দূরে সরে যাক। সে হয়তো ভাবছে সব স্বাভাবিক আছে। আমি যে কি কষ্ট পেয়েছিলাম যখন তাকে ভালোবাসা বাদ দিয়েছিলাম। দিনের পর দিন রাতের পর রাত কেদেছি। এক সময় সব স্বাভাবিক হয়েছে। আসলে কি হয়েছে? না রহিমভাইয়ের কথা মনে পড়লেই বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠে।
বাসার কাছে আসতেই সে নেমে অন্য রিকশায় উঠে পড়লো।
কি হলো চলে যাচ্ছো কেন, বাসায় আসবে না? প্লিজ পাগলামো করো না। তোমার পায়ে পড়ি, মা আমার ওপর রাগ করবেন তোমাকে না দেখলে।
রাগবে না। তুই কিছু একটা বলে দিস।
বলেই রিকশাওয়ালাকে চালাতে বললো। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। কারো সামনে না গিয়ে টয়লেটে গিয়ে শাওয়ার ছেড়ে কাদলাম। টয়লেট থেকে বের হতেই মায়ের সামনে পড়লাম। মা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, রহিম এভাবে চলে গেল কেন, তুই কি তাকে কিছু বলেছিস?
আমি কি বলবো। তাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করো, আমাকে বলছো কেন? আমি একটু রাগ দেখালাম যাতে মা আর প্রশ্ন না করে। আমি জানি মা রহিমভাইকে অসম্ভব পছন্দ করেন। আমি খুলে না বলা পর্যন্ত তিনি জেরা করতে থাকবেন।

চিনু, তোর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা হয়েছে।

মাকে সব বললাম। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। মাকে ধরে কাদতে লাগলাম। মাও কাদছে। জানি আমার যেমন কষ্ট হচ্ছে মাও তারচেয়ে কম কষ্ট পাচ্ছেন না।

রাত তিনটায় আমার ঘুম ভাঙলো। এলোমেলো ভেবে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি। বুক ভেঙে কান্না আসতে লাগলো এ অক্ষমতার জন্য। বিধাতা কিছু মানুষকে শুধু কষ্ট পাবার জন্যই পাঠায়, আমি তাদেরই একজন। তিনি কেন আমার ওপর এমন অমানবিক আচরণ করলেন!

সবার একটা চাহিদা থাকে, সেটা হলো যৌবনে একজন মনের মতো মানুষকে বিয়ে করে সংসার করা। আর সে সংসারে একটা নতুন মুখ। সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতাই বিধাতা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। বিধাতা কেন তাকে এমন কষ্ট দিল?

ফোন করতেই রহিমভাই ধরলো।

কি ঘুমাওনি?

না, কাজ করছি।

কি কাজ?

কাগজপত্র গোছাচ্ছি। আমার ভেতরটা যেন কেমন করে উঠলো। এতো রাত জেগে কাগজ গোছাচ্ছে, এর মানে কি?

কি কাগজ?

তোকে বলা যাবে না, তুই না ঘুমিয়ে জেগে আছিস কেন?

এমনি ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম তুমি কি করছো খোজ নিয়ে দেখি। তুমি তো রাত জেগে কাজ করো তাই।

রহিমভাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বললো, ঘুমাতে যা নইলে শরীর খারাপ করবে, তুই আবার রাত জাগতে পারিস না।

তোমার কি আমার জন্য খারাপ লাগছে?

না খারাপ লাগবে কেন, তোর ভালোর জন্য বললাম।

ও! আমার ওপর রাগ করে আছো?

না, রাগ করার কি আছে। আমি বাস্তবটা গ্রহণ করতে জানি তবে খারাপ লাগে এই ভেবে, তুই আমাকে চিনতে পারিসনি। যে দিন চিনতে পারবি... সে দিন হয়তো...?

থামলে কেন বলো?

থাক বলে লাভ কি। যা ঘুমা, আমার অনেক কাজ বাকি। সকালে বের হতে হবে, অনেক জায়গায় যেতে হবে বলেই রহিমভাই ফোন রেখে দিল।

আমার খারাপ লাগছে, বুকটা ফেটে যাচ্ছে কষ্টে। জানি রহিমভাইকে কষ্ট দিচ্ছি। এছাড়া কি করার আছে, কি করবো। তাকে জীবন সঙ্গী করলেও সংসারের পরিপূর্ণ স্বাদ দিতে পারবো না। আমি কিছুতেই সেটা মেনে নিতে পারছি না। আমার প্রিয় কিছু মানুষের মধ্যে সে হলো অন্যতম।

তিন দিন আমি রহিমভাইয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করিনি, সেও করেনি। মাঝে মা অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিল কেন সে এতোদিন আসছে না। রহিমভাই দিনে একবার হলেও ফোন করে না হলে বাসায় আসে। আমি কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না।

ভোর বেলা আমি শোয়ার ঘরে রহিমভাইকে পেলাম। সে কাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আমি তার কাথার নিচে ঢুকে পড়লাম। তাকে জড়িয়ে ধরতেই চমকে উঠলো।

তুই এভাবে আমার কাথার নিচে ঢুকে পড়লি, কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে।

দাড়াও দরজা বন্ধ করে আসি, তা হলে কেউ বুঝতে পারবে না আমরা কি করছি।

আমি দরজা বন্ধ করে রহিমভাইয়ের বুকে ঝাপিয়ে পড়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। শ্বাস ছাড়তেই রহিমভাই বললো, এমন ছেলেমানুষি করছিস কেন, আমার ভালো লাগছে না, ছাড় বসতে দে।

না তোমাকে জড়িয়ে থাকবো। বলেই আরো শক্ত করে ধরলাম।

রহিমভাই এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আমার অতীত মনে পড়লো–

ক্লাস নাইনের বার্ষিক পরীক্ষার পর বড়খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমাচ্ছিলাম। বিকেলের দিকে নজরুলভাই রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আমার বুকে হাত দিলেন। হাতের স্পর্শে জেগে উঠলাম। ছাড়তে বললে সে আমাকে ছাড়তে চাইলো না। জোরাজুরিতে তার সঙ্গে এক সময় হেরে গেলাম। সে শরীরটা নিয়ে যা খুশি তা করলো। জামা কাপড়ে রক্ত দেখে ভয় পেলাম। সে আমাকে নানাভাবে বুঝিয়ে বাথরুমে নিয়ে পরিষ্কার করলো।

রাতে জ্বর এলো, ভয়ে আর লজ্জায়। একদিন পর আবারও সে ভোগ করলো আমাকে। সেদিন অনেক কেদেছি। কাউকে কিছুই বলতে পারিনি, বলার সাহস পাইনি।

একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে মিলনের পর কি হতে পারে তা আমি জানতাম না। আমার যৌন শিক্ষা বা জ্ঞান ছিল না।

এক সময় আমার শরীরে নজরুলভাইয়ের অস্তিত্ব জানান দিল। মাকে ঘটনা বলতেই তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ছুটে গেলেন নজরুলভাইয়ের কাছে। নজরুলভাইয়ের আসল চরিত্রটা বেরিয়ে এলো সে সময়। মাকে যা তা বলে অপমান করলো। আমাকেও ছাড়লো না।

আমাকে নিয়ে মা একটা ক্লিনিকে গর্ভপাত করালেন। বাসায় কেউ জানতে পারলো না। মা আমাকে বললেন, এ ব্যাপারে কাউকে যেন কিছু না বলি।

আমি ভুলতে চাইলাম এ কালিমাটুকু। ভুলতে চাইলেই কি মানুষ সব পারে? পারে না। আমি পারিনি আমার শরীর তা জানান দিলো নতুন রূপে।

প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হতে লাগলো আমার। ভালো ডাক্তার দেখানো হলো। জরায়ুতে ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। বাচতে হলে কেটে ফেলতে হবে। কারণ সে অ্যাবরেশনটা ভালো হয়নি। মা লোকলজ্জার ভয়ে যেন–তেন ডাক্তার দিয়ে অ্যাবরেশনটা করেছেন, যার ফলে এমন হয়েছে।

আমি এসব কিছুই জানতাম না। শুধু জানতাম আমার একটা অপারেশন হবে, সে সময়টাতে জরায়ু কি, তার ফলে কি হয় আমি বুঝতাম না। এটুকু বলে আমি থামলাম।

রহিমভাই আমার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে।

তোমার মনে আছে রহিমভাই, আমি যেদিন হাসপাতালে আসবো সেদিন তুমি বাসায় এসে হাজির হলে। খুবই খুশি হয়েছিলাম তোমাকে দেখে। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি ভালো থাকবো। মাকে বলেছিলাম তোমাকে বলার জন্য কিন্তু মা কড়া নিষেধ করেছেন যেন তোমাকে না ডাকি, তোমাকে কিছুই না জানাই, তাতে আমার ক্ষতি হবে। কিছুই ভালো লাগছিল না। আল্লাহর কাছে বার বার বলতে লাগলাম তুমি যেন চলে আসো। কাকতালীয়ভাবে সেদিন তুমি এলে। আমি একটু একটু করে তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। তুমি এলেই অজানা এক ভালো লাগায় আমাকে গ্রাস করতো। সারাক্ষণ তোমাকেই ভাবতাম, তেমন কিছু বলতে পারতাম না।

মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও আমার সঙ্গে হাসপাতালে এলে। আমার একটুও ভয় কিংবা টেনশন হয়নি তুমি পাশে থাকাতে। অপারেশন খুব ভালো হয়েছিল।

অপারেশনের পর মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগলেন। বার বার বলতে লাগলেন–

মা, আমি তোর জীবনটা নষ্ট করে দিলাম, তোর জীবনটাকে নষ্ট করে দিলাম।

আমি মায়ের এ কান্নার কোনো অর্থ খুজে পেলাম না, কেন তিনি এমন কথা বলছেন। পরে শুনলাম আমার জরায়ু কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। যে জরায়ুতে সন্তান ধারণ করি সেটাই আমার নেই। নারী হয়েও নারীত্বের

স্বাদ নিতে পারবো না, সন্তানের মা ডাক শুনতে পারবো না, এটা যে কি কষ্টের তা তোমাকে বুঝাতে পারবো না। সে সময় আমি মরে যেতে চাইছিলাম। তোমার কথা ভেবে পারিনি।

কথাগুলো বলতে বলতে কেদে ফেললাম। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কাদবো না, কিন্তু পারিনি। রহিমভাই চুপ করে থাকলো।

আমার চোখ মুছিয়ে বললো, দেখ মানুষের নিয়তির ওপর হাত নেই। তোর অসুখের সময় সব জেনেছি কেন মেয়েদের এমন হয়। জরায়ুর সমস্যা সাধারণত দেখা দেয় ৪০-৫০ বছর পর, যে সময়টাতে মেয়েদের সন্তান ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তাদের বেলায় এমন হবে, জরায়ুতে সমস্যা দেখা দেবে, মাসিকে সমস্যা হবে।

তোর বেলায় এমন হবে কেন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। অল্প বয়সি মেয়েদের বেলায় সাধারণত অবৈধ সম্পর্ক থেকে এমন হয়। তোর বেলায়ও এমন হয়েছে আমি নিশ্চিত হলাম। ধরতে পারলাম না কেন কার সঙ্গে এমন করেছিস, কেন তোর জরায়ু ফেলে দিতে হলো?

প্রথম আমার খুব খারাপ লাগলো। পরে তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সব ভুলে যাই। কারণ তুই আমার প্রথম ভালোবাসা। ক্রমেই আমার ভালোবাসা গভীর হয়।

এ জীবনে আমি কোনো জিনিস পাইনি, শুধু তোকে চেয়েছিলাম। তাতে তুই সায় দিচ্ছিস না, আমার স্বপ্নকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিস। ঠিক আছে যা খুশি কর, তোকে কিছুই বলবো না, কোনো অনুরোধও করবো না। যদি আমাকে ভুলে থাকতে পারিস তা হলে আমিও পারবো।

রহিমভাইয়ের কথা শুনে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। রহিমভাই উঠে চলে যাচ্ছিল। আমি হাত টেনে ধরলাম। নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। রহিমভাইয়ের ভালোবাসা অবহেলা করা সম্ভব নয়।

ঢাকা থেকে

বেদনার বালুচরে

লাবণ্য

পচিশ বছরের এই আমি কখনো বুঝতে পারিনি জীবনে *ভালোবাসা* শব্দটির তাৎপর্য কি এবং মানুষের মধ্যে এ শব্দের গভীরতা কতোটুকু? জীবনে প্রেম বা ভালোবাসা যা-ই বলা হোক না কেন, তা যে একেবারেই আসেনি সেটা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু সেই ভালোবাসা শীতের অতিথি পাখির মতো গরমের আবির্ভাবে উড়ে অন্য কোনো স্থানে গিয়ে হয়তো নতুনভাবে নীড় গড়েছে।

বাস্তবতাকে দেখেছি। জীবনে যা ঘটবে তা অনস্বীকার্য। তাই সে রকমভাবে কখনো চিন্তা করি না। কিন্তু নিজেকে প্রস্তুত রাখার চেষ্টা করি পরিস্থিতির প্রয়োজনে। পরিবার, বন্ধুমহল এবং চাকরি ক্ষেত্রে আমার বর্ণনা খুবই জেদি, বাস্তববাদী এবং সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবসম্পন্ন মেয়ে, বান্ধবী ও সহকর্মী হিসেবে। জীবনে এমন কিছু কঠিন সময় অতিক্রম করেছি সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস ও ধৈর্য নিয়ে, যার ফলে আজ নিজের অবস্থান করেছি সুদৃঢ় ও অগ্রগামী।

বসন্তের কোকিলের মতো ভালোবাসার উপস্থিতি ঘটলেও জীবন সংগ্রামের তাগিদে চোখ মেলে দেখার সুযোগ বা সময় কোনোটিই পাইনি। এক বছর ধরে ভালোবাসা নামক ভাইরাসটি আমার মধ্যে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। আমি এখন নিজেকে বাস্তব অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে এসেছি। যাকে ভালোবাসি তাকে এখন পর্যন্ত সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হয়নি। পরিচয় ইন্টারনেটের বদৌলতে তিন বছর ধরে। ভালোবাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি এক বছরের একটু বেশি হবে। জোর গলায় বলছি তাকে ভালোবাসি কারণ আমার প্রতিটি দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবির থাকে আমার চিন্তায়, মননে ও মস্তিষ্কে।

জানি না এর ভবিষ্যৎ কি। ভেবেও দেখিনি কখনো, ওই যে বলেছি নিজেকে তৈরি রেখেই আগামীর দিকে পথ চলা। বলাই তো হলো না, আবির এখন কানাডায় আর আমি বাংলাদেশে। নতুন বছরে তার আসার কথা, মুখোমুখি হওয়ার কথা। আমার ভালোবাসার রেজাল্ট জানি না কি হবে আর কি হবে না। হয়তো লিখবো মিলনের কাব্য নয়তো বিচ্ছেদের কোনো করুণ কাহিনী।

কারণ শিল্পী কিশোর কুমার তো গেয়েছেন, *কি আশায় বাধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে। নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে নিশিদিন খেলা করে, বেদনার বালুচরে।*

ঢাকা থেকে